আজ শুভদিন

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

উজ্জ্বল-সাহিত্য-মন্দির

কুণ্ডু ব্যাক্তিগত পাঠাগার

www.Banglaclassicbooks.blogspot.in

আমার কথা

বাংলা বইয়ের স্বর্ণখনি আমার সংগ্রহে আছে। যে বইগুলো আমার পছন্দ এবং ইতিমধ্যে ইন্টারনেটে পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলো নতুন করে স্ক্যান না করে পুরনোগুলো বা এডিট করে নতুন ভাবে দেবো। যেগুলো পাওয়া যাবেনা, সেগুলো স্ক্যান করে উপহার দেবো। আমার উদ্দেশ্য ব্যবসায়িক নয়। শুধুই বৃহত্তর পাঠকের কাছে বই পড়ার অভ্যেস ধরে রাখা। আমার অগ্রণী বইয়ের সাইট সৃষ্টিকর্তাদের অগ্রিম ধন্যবাদ জানাচ্ছি যাদের বই আমি শেয়ার করব। ধন্যবাদ জানাচ্ছি বন্ধু অপ্টিমাস প্রাইম ও পি. ব্যান্ডস কে – যারা আমাকে এডিট করা নানা ভাবে শিখিয়েছেন। আমাদের আর একটি প্রয়াস পুরোনো বিস্মৃত পত্রিকা নতুন ভাবে ফিরিয়ে আনা। আগ্রহীরা দেখতে পারেন www.dhulokhela.blogspot.in সাইটটি।

আপনাদের কাছে যদি এমন কোনো বইয়ের কপি থাকে এবং তা শেয়ার করতে চান - যোগাযোগ করুন -

subhajit819@gmail.com.

PDF বই কখনই মূল বইয়ের বিকল্প হতে পারে না। যদি এই বইটি আপনার ভালো লেগে থাকে, এবং বাজারে হার্ড কপি পাওয়া যায় – তাহলে যত দ্রুত সম্ভব মূল বইটি সংগ্রহ করার অনুরোধ রইল। হার্ড কপি হাতে নেওয়ার মজা, সুবিধে আমরা মানি। PDF করার উদ্দেশ্য বিরল যে কোন বই সংরক্ষণ এবং দূর দূরান্তের সকল পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া। মূল বই কিনুন। লেখক এবং প্রকাশকদের উৎসাহিত করুন।

There is no wealth like knowledge, No poverty like ignorance

SUBHAJIT KUNDU

প্রকাশক—
শ্রীশরৎচন্দ্র পাল
উজ্জ্বল-সাহিত্য-মন্দির
সি ১১বি, বি. কে. পাল এভিনিউ,
কলিকাতা-৫

মুদ্রাকর—শ্রীনিমাইচরণ ঘোষ
ডায়মণ্ড-প্রিন্টিং-হাউস,
৭৯এ, দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

পরিচালক—

শ্রীহীরালাল সাহা

আড়াই টাকা সংস্করণে
প্রকাশিত হয়েছে,
কথাসাহিত্যের যুগপ্রবর্ত্তক
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের
প্রিয়া ও প্রিয়
রচনার মুন্সীয়ানায়, গঠনসৌন্দর্য্যের
আধুনিকতম পরিকল্পনায়
এ উপন্যাসের তুলনা নাই।
দাম মাত্র আড়াই টাকা

আজ শুভদিন

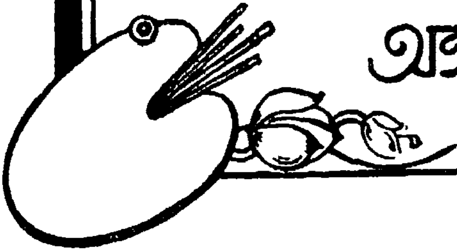

অঙ্গরাগ

কাহিনী—

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

'শুকসারী-গোলাপ' (রঙিন পুস্তনী) এঁকেছেন—

শ্রীমনোজ বসু

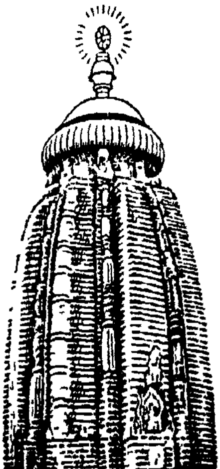

'প্রচ্ছদপট-আবরণী' (র‍্যাপার) এঁকেছেন—

শ্রীবলাইবন্ধু রায়

পরিকল্পনা—

শ্রীসত্যনারায়ণ দে

উজ্জ্বল-সাহিত্য-মন্দির

বহুমুখী প্রতিভা থাকলে তবে একঘেয়ে একটানা লেখার স্রোতের প্রতিকূলে উজান বহানো যায়!

* * * * * *

অপ্রতিদ্বন্দ্বী কথাশিল্পী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

আলোকাভিসার

উপন্যাস ছাপা হচ্ছে।

রচনায় আগামী-দিনের নূতন সম্ভাবনার সমারোহ! গঠনসৌন্দর্য্য অভিজাত—প্রগতিযুগের নব সংস্কৃতি-লুব্ধ সুধীবৃন্দের হৃদ্য ও রুচ্য! খুব শীগগির প্রকাশিত হবে।

আজ শুভদিন

ছোট্ট দুটি মেয়ে। ফুট্‌ফুটে সুন্দর চেহারা। পুতুল খেলার বয়স।

সবাই বলে, এরা যেন এক মায়ের পেটের দুটি বোন্‌।

কিন্তু তাহা নয়।

একই গ্রামে কাছাকাছি দু-খানা বাড়ী।

একটি বড়লোকের প্রকাণ্ড অট্টালিকা, আর-একটি নিতান্ত দরিদ্রের এক জরাজীর্ণ কুটীর।

যে-বয়সে ধনী-দরিদ্রের বিশেষ কোনও প্রভেদ-পার্থক্য থাকে না, ওদের তখন সেই বয়স।

সুকুমারী গরীবের মেয়ে। মা নাই, বাবা নাই, দাদার সংসারে কোনোরকমে দু-বেলা দুটি অন্ন মুখে দিয়া পরম আনন্দেই দিন কাটাইতেছে।

দিনের অধিকাংশ সময় অবশ্য তাহার সুরবালার বাড়ীতেই কাটে। ইজের পরিয়া, ছেঁড়া ফ্রকটি গায়ে দিয়া সে ছুটিয়া আসে সুরবালার কাছে।

শুধু যে পুতুল খেলিতেই আসে তাহা নয়। আসিবার অন্য কারণও থাকে।

সুকুমারী যখন আসে, সুরবালার হয়তো তখন সবেমাত্র ঘুম ভাঙিয়াছে। তাহাবও বাড়ীতে আপনার বলিতে এক বিধবা মা ছাড়া আব কেহ নাই। তেমহলা প্রকাণ্ড বাড়ী। দাস-দাসীতে বাড়ী দিনরাত গম্‌গম্‌ করে।

মোক্ষদা-এ-বাড়ীর সবচেয়ে পুরনো দাসী।

সুরবালাব ঘুম ভাঙিতেই মোক্ষদা আসিয়া দাঁড়ায়। সুববালাকে লইয়া যায় স্নানের ঘরে।

সেখান হইতে সুববালা বাহির হইয়া আসে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ফিট্‌ফাট্‌ জামা-ইজের পরিয়া।

অন্য ঝি তখন দুধেব বাটি লইয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

দুধের বাটিতে হাত দিয়াই সুরবালার নজর পড়ে সুকুমারীর উপর। দুধ সে একা খাইবে না। সুকুমারী আগে খাক্‌, তবে সে হাত দিবে দুধের বাটিতে।

সুকুমারীর দুধ কিন্তু কম হইলে চলিবে না। সে যদি এক বাটি খায়, সুকুমারীকেও এক বাটি দিতে হইবে। এক বাটি দুধে খুব খানিকটা জল ঢালিয়া এক বাটি ভর্ত্তি করিয়া আনিয়া

ঝি বলে, 'কই গো সুকুরাণী, এসো। অদেষ্টে তোমার আছে দুধ খাওয়া, কে খণ্ডন করবে বলো!'

এমনি প্রত্যহ।

ঝি বলে, 'তাই একটু দেরি করে' আয়। তা না, ঠিক খাবার সময়টিতেই এসে হাজির হবে।'

এইরকম সব টিকাটিপ্পনী বুঝিবার মত বুদ্ধি সুকুমারীর আছে। পরের দিন একটু সে দেরি করিয়াই আসে।

কিন্তু দেরি করিয়া আসিলে কি হইবে?

সুরবালা ঝোঁক ধরিয়া বসে, 'সুকুমারীর দুধ তোমরা রেখেছো কিনা দেখি, তারপর খাবো।'

সুতরাং সুকুমারীর জন্য একবাটি দুধ রাখিয়া দিতে হয়।

সেদিন আবার আর-এক ফ্যাসাদ!

দুধ বলিয়া নেহাৎ একবাটি সাদা জল রাখিবে—সুকুমারী যদি তার বন্ধুকে সেকথা বলিয়া দেয় তো সুরবালা হয়তো এই লইয়া একটা হুলুস্থুল কাণ্ড বাধাইয়া বসিবে, তাই ঝি সেদিন বুদ্ধি খাটাইয়া সুকুমারীর দুধের বাটিতে দু'চামচ চিনি ফেলিয়া দিয়াছিল।

সুকুমারী যখন খাইবে, চিনি তখন গলিয়া যাইবে ভাবিয়া চিনিটা ঝি দুধের সঙ্গে নাড়িয়া দেয় নাই।

সুকুমারী ঘড়ি ধরিয়া আসে না, সুরবালাও ঘড়ি ধরিয়া শয্যাত্যাগ করে না।

আজ শুভদিন

সুকুমারী সেদিন যখন আসিল, সুরবালার দুধ তখনও খাওয়া হয় নাই।

দু'জনের দু'বাটি দুধ। সুকুমারী চোঁ চোঁ করিয়া খাইয়া বাটিটা নামাইয়া দিল। সুরবালা লক্ষ্য করিল তাহার বাটির নীচে অনেকখানি চিনি পড়িয়া আছে।

লক্ষ্য করিল, কিন্তু কিছুই বলিল না। যে ঝি চিনি দিয়াছিল, তাড়াতাড়ি বাটিটা তুলিয়া লইয়া সে চলিয়া গেল। বুকের ভিতরটা তাহার ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল।

ইহার ফল ফলিল দু'দিন পরে।

সুকুমারী সেদিন ঠিক সময়েই আসিয়াছে। সুরবালার দুধ তখনও খাওয়া হয় নাই।

দু'জনের দু-বাটি দুধ আসিল।

সুরবালার হঠাৎ বোধহয় মনে পড়িয়া গেল চিনির কথা। চট্ করিয়া সে তাহার নিজের বাটিটা সুকুমারীর দিকে বাড়াইয়া দিয়া, সুকুমারীর দুধের বাটিটা তুলিয়া লইল।

ঝি হাঁ হাঁ করিয়া নিষেধ করিল, বাটিটা তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইতে গেল, কিন্তু কোনও ফলই হইল না। সুরবালা বলিল, 'না, এতে চিনি দাও তোমরা। আমার দুধে চিনি দাও না—আমি ও-দুধ খাবো না।'

সুকুমারী অত-সব বুঝে নাই। সে তখন সুরবালার দুধের বাটিটা শেষ করিয়া দিয়াছে।

আর সুরবালা?

আজ শুভদিন

দুধে মুখ দিয়াই মুখটা বিকৃত করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

—'জল! হতভাগী জল দিয়েছে একবাটি!'

এই বলিয়া বাটিটা সে মেঝের ওপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

ঝন্ ঝন্ করিয়া বিকট আওয়াজ হইল। সাদা জল চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

আওয়াজ শুনিয়া পূজার ঘর হইতে মা ছুটিয়া আসিলেন।

কাঁসার বাটি অনেকখানা চিড় খাইয়া গিয়াছে। সুরবালার চীৎকার তখনও থামে নাই।

ব্যাপারটা কি হইল মা জানিতে চাহিলেন।

ঝি তাঁহাকে একটু আড়ালে লইয়া গিয়া বলিল, 'কিছু হয়নি মা, ওই আদেকলা মেয়েটা রোজ ঠিক এই সময়েই আসে, খুকুমণি দুধ খায় আর ও তার মুখের পানে একদিষ্টে চেয়ে থাকে, ঢোঁক্ গেলে, তাই ওকেও একটুখানি দিই—'

এই বলিয়া চোখমুখের ইসারা করিয়া কি যেন বুঝাইয়া বলিল, 'হ্যাঁ মা, দিই একটু চিনি মিশিয়ে। তা খুকুমণি আজ ওর দুধটা তুলে নিয়ে বলে, ওইটে আমি খাবো। ওতে চিনি থাকে। আমার দুধে চিনি দাও না তোমরা। হাঁ হাঁ করে' কেড়ে নিতে গেলাম হাত থেকে। দিলে না কিছুতেই। ঢক্ ঢক্ করে' খেয়ে ফেললে খানিকটে। তা ও দুধ খুকুমণির ভাল লাগবে কেন মা? তাই ফেলে ছড়িয়ে একাকার করে' দিলে।'

মা বলিলেন, 'তাই দিও, কাল থেকে ওকেও একটু ভাল দুধই দিও।'

এই বলিয়া মা চলিয়া গেলেন।

সুরবালার জন্য আর-একবাটি দুধ আসিল।

ঝি'দের সেদিন মজলিস বসিল।—মানুষের অদৃষ্ট সম্বন্ধে অনেক রকমের অনেক কথা হইল।

মোক্ষদা বলিল, 'অদেষ্টের কথা যদি তুললি তো শোন্ বলি। আমার এক ভাশুরঝি—এম্‌নি হ্যাংলা প্যাঁকাটির মতন চেহারা, বিয়ে একটা দিয়েছিল, তিন মাস যেতে না যেতেই বিধবা হয়ে ফিরে এলো। বাড়ীতে বিধবা মা, ধান ভেনে এর-ওর বাড়ীতে গতর খাটিয়ে কোনোরকমে পেট চালাচ্ছিলো। হঠাৎ একদিন গাঁয়ের এক জামাই এলো কলকাতা থেকে। মেয়েটাকে সঙ্গে করে' নিয়ে গেল কলকাতার বাসায়। বললে, ঝি পাচ্ছি না ওখানে, মেয়েটা ঝিএর কাজ করবে। তা বলবো কি বোন্, বছর চার-পাঁচ মেয়েটা আর গাঁয়ে ফিরলো না। চিঠি নেই, পত্র নেই, টাকা-কড়ি যা পাঠাতো তাও বন্ধ হয়ে গেল। মা তো ভেবে ভেবে সারা। শেষে ভাবলে মেয়েটা হয়তো মরে-টরে গেছে, জামাই বলছে না। জামাই গাঁয়ে আসতেই মা জিজ্ঞাসা করলে। জামাই বললে, ওর কথা আর বোলো না। আমার বাড়ী থেকে পালিয়েছে মেয়েটা। কোথায় আছে জানি না। তারপর পাঁচবছর পরে মেয়েটা

গাঁয়ে ফিরলো হাওয়াগাড়ীতে চেপে। দেখলে আর চেনা যায় না—রূপ যেন ফেটে পড়ছে! গাঁয়ের লোক দলে দলে দেখতে এলো তাকে। সবাই বলে, হ্যাঁলা, তুই বড়লোক হলি কেমন করে'? মেয়েটা বললে, লটারির টিকিট কিনে-ছিলাম, টাকা পেয়েছি। এখন কলকাতায় আমি বাড়ী করেছি। মাকে নিয়ে যাবো। তাই একবার এলাম এখানে। মা তার যাবার জন্যে তৈরী হয়েই ছিল। মোট-পুঁটলি নিয়ে হাওয়াগাড়ীতে চড়ে চলে গেল কলকাতায়। একেই বলে কপাল।'

যে-মেয়েটা দুধ দেয় সে বলিল, 'আমি বলছি ওই সুকু মেয়েটার কথা। দাদা-বৌদির সংসারে লাথিঝাঁটা খেয়ে মানুষ হচ্ছিস্, দুদিন বাদে আমাদের মতন কারও বাড়ীতে ঝি-গিরি করবি, আর নয়তো খাবি পথে পথে ভিক্ষে করে', তোর আবার একবাটি দুধ খাওয়া কেন?'

ঠাকুরবাড়ীতে কাজ করে যে-মেয়েটি, এ-সব ব্যাপারের সে কিছুই জানিত না। বলিল, 'ওমা, তাই নাকি? সেই ছোট মেয়েটা—আমাদের খুকুমণির সঙ্গে যে খেলা করে—তাকে দুধ দিতে হয় নাকি?'

ঝি বলিল, 'তবে আর বলছি কি! দিচ্ছিলাম একটুখানি দুধে খানিকটা জল ঢেলে একটু চিনি মিশিয়ে। কাল থেকে আবার তাও চলবে না। খাঁটি একবাটি দুধ ওই মেয়েটাকেও দিতে হবে।'

—'না না, তুই যা দিচ্ছিলি তাই দিবি। ও মা আমার কে রে। কোথাকার একটা পথের ভিখিরী, তাকে রোজ দুধ খাওয়াতে হবে? মরণ আর-কি।'

ঝি বলিল, 'তুমি তো ভাই বলেই খালাস্। আমার যে হয়েছে মুস্কিল। আমাদের খুকুমণি যে ওই মেয়েটার জন্যে পাগল। মেয়েটা একদিন আসেনি। খুকুমণি কাঁদতে বসলো। মা বললে, যা বাছা ক্ষুদু, ছুটে একবার যা ওদের বাড়ী। নিয়ে আয় মেয়েটাকে। কি আর করবো, গেলাম। সে কি বাড়ী মা, ওর চেয়ে আমাদের বাড়ী ভাল।'

এমন সময় গিন্নির ডাক শোনা গেল। কথাটা তাহার শেষ হইল না।

—'কোথায় রে—ক্ষুদু রয়েছিস্?'

—'যাই মা।'

ক্ষুদু উঠিল। বলিল, 'ইচ্ছে করলে মেয়েটার আসা আমি বন্ধ করে' দিতে পারি।'

ঠাকুরবাড়ীর ঝি বলিল, 'তাই দে না। বলবি হয়তো—তোর কি? ছোট একটা মেয়ে আসছে, খাচ্ছে, তাতে তোর কি? তা ভাই সত্যি বলতে কি, আমি ও-সব সহ্য করতে পারি না, এইসব অনাছিষ্টি কাণ্ড-কারখানা দেখলে বুক চড়চড় করে।'

তা বুক চড়চড় যাহার করে করুক্, সুকুমারী তাহার ছেঁড়া ফ্রকটি গায়ে দিয়া নিয়মিত আসিতে লাগিল।

আজ শুভদিন

তাহার সেই ছেঁড়া ফ্রকটি ময়লা হইয়াছিল। সুরবালা রোজ রোজ নূতন নূতন জামা গায়ে দেয়। সুকুমারীর লজ্জা করে। জামাটায় একটু সাবান দিয়া পরিষ্কার করিবার কথা সেদিন সে তাহার বৌদিদিকে বলিল।

বৌদিদি বলিল, 'তা সাবান কোথায় পাবো লবাবের মেয়ে? রোজ রোজ পরিষ্কার জামা যদি গায়ে দিতে হয়, তোর দাদাকে বলবি।'

দাদাকে সে বলে নাই। বলিতে পারে নাই। রাত্রে তাহার ছেঁড়া নোংরা মাদুরটির উপর শুইয়া শুইয়া কাঁদিয়াছে শুধু। নিজের মা যাহার নাই, এ পৃথিবীতে তাহার কেহই নাই।

দু'বছর আগে তাহার মা মরিয়াছে। সে তখন পাঁচ বছরের মেয়ে। সবই তাহার মনে পড়ে। মা তাহার অসুখে ভুগিয়াছিল মাত্র দশদিন। ডাক্তার আসে নাই, কবিরাজ আসে নাই, কি যে হইয়াছিল কিছুই সে জানে না। এইটুকু শুধু জানে—মা তাহার মরিতে চায় নাই। মরিবার আগে মা'র মুখ দিয়া কথা বাহির হয় নাই, দুই চোখ দিয়া দর্‌দর্‌ করিয়া শুধু জল গড়াইয়াছিল।

বাবা যে তাহার কখন মরিয়াছে জানে না। হয়তো তখন সে নিতান্ত ছোট। হয়তো তখন তাহার জ্ঞানবুদ্ধি কিছুই হয় নাই।

মৃত্যু সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা তাহার ছিল না বলিলেই হয়। মানুষ যে কেমন করিয়া মরে সুকুমারী তাহা জানিত না।

তাহার মা'র চোখ দিয়া জল পড়া যখন বন্ধ হইয়া গেল, সে ভাবিয়াছিল, মা বুঝি তাহার ঘুমাইয়া পড়িল। তাহার দাদা ছিল মা'র পায়ের কাছে বসিয়া। 'মা! মা গো!' বলিয়া চীৎকার করিয়া দাদা যখন কাঁদিয়া তার মা'র পায়ের উপর আছাড় খাইয়া পড়িল তখন সেও কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল।

তাহার পর পাড়ার একটি মেয়ে তাহাকে লইয়া গিয়াছিল। কেন লইয়া গিয়াছিল তখন বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু এখন সে সবই বুঝিয়াছে। পাছে সে তাহার মা'র মৃতদেহ দেখিয়া কাঁদে, সেইজন্য তাহার অসাক্ষাতে মায়ের মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া গিয়া পুড়াইয়া দিয়াছিল।

সেইদিন হইতে মাকে সে আর দেখিতে পায় নাই।

কেহ মা বলিয়া ডাকিলেই তাহার মায়ের সেই মরা মুখখানি মনে পড়ে। বুকের ভিতরটা কেমন যেন করিতে থাকে। চোখ দুইটা জলে ভরিয়া আসে।

সুকুমারী কোথাও যখন এতটুকু সাবান সংগ্রহ করিতে পারিল না, তখন সে একদিন লজ্জা-শরমের মাথা খাইয়া সুরবালাকেই বলিয়া ফেলিল, 'আমাকে একটু সাবান দিতে পারিস্ সুরো! আমার এই জামাটা পরিষ্কার করবো।'

সুরবালা তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া স্নানের ঘরে গিয়া আস্ত একটা গায়ে-মাখা ভাল সাবান আনিয়া সুকুমারীর হাতে দিয়া বলিল, 'এই নে। গায়েও মাখতে পারবি, জামাতেও দিতে পারবি।'

সুকুমারী বলিল, 'মা তোর বকবে না তো ভাই?'

সুরবালা বলিল, 'মা আমাকে বকে?'

সেই সাবান দিয়া সেইদিনই পুকুরের ঘাটে বসিয়া বসিয়া সুকুমারী তাহার জামা পরিষ্কার করিল, ইজের কাচিল, শেষে গায়ে মাথায় মাখিয়া অবেলায় স্নান করিয়া ঘরে যখন ফিরিল, বৌদিদি বলিল, 'সাবান কোথায় পেলি? তোর দাদা এনে দিয়েছে বুঝি?'

সুকুমারী বলিল, 'না, দাদা দেয়নি, সুরবালাদের বাড়ী থেকে এনেছি।'

বৌদিদি বলিল, 'এইটুকু মেয়ে, নিজেরটি কেমন বোঝে ছাখো! বড়লোক বন্ধু পেয়েছিস্, বড়লোকের বাড়ী রোজ দুবেলা যাওয়া-আসা করছিস্, এমনি দু'একটা ভাল ভাল জিনিস লুকিয়ে-চুরিয়ে এনে যে বৌদিদির হাতে দিয়ে বলবি, এই নাও বৌদি, এইটে তুমি ব্যাভার কোরো, তা না! নিজের দরকার হয়েছে কিনা আজ, তাই ছাখো, সাবানটা কেমন চুরি করে' এনেছে।'

সুকুমারী বলিল, 'না না, চুরি করে' আনবো কেন বৌদি, চুরি আমি কখনও করি না। দিয়েছে আমাকে।'

বৌদিদি সেকথা বিশ্বাস করিল না। বলিল, 'হ্যাঁ। চুরি করিনি বললেই আমি বিশ্বাস করবো। ওইরকম ভাল দামী সাবান দিয়েছে ওকে জামায় কাপড়ে ঘষতে।'

সুকুমারী বলিল, 'সত্যি বলছি বৌদি, সুরো আমাকে দিয়েছে। চুরি আমি করিনি।'

বৌদিদি বলিল, 'তা বেশ করেছিস্, সাবানের সুখে অবেলায় চান করলি, দেখিস্, যেন আবার জ্বরে-টরে পড়ে' আমাকে ভোগাস্নি। চ' খাবি চ'।'

আবার কাজে লাগিবে বলিয়া সাবানটি সে যত্ন করিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু পরদিন সেটি আর সে খুঁজিয়া পাইল না।

সুকুমারী বলিল, 'বৌদি, আমার সাবানটা তুমি দেখেছো ?'

যেই বলা, বৌদি অম্নি ফোঁস্ করিয়া উঠিল। বলিল, 'আমি তোর সাবান দেখবো কি লা ? আ-মর্, পোড়ারমুখী বলে কি গা।'

সুকুমারী আর একটি কথাও বলিতে পারিল না। মনের দুঃখে চুপ করিয়া রহিল।

ভাবিয়াছিল, সুরবালাকেও সেকথা বলিবে না।

কিন্তু বলিতে হইল।

সুরবালা সেদিন বলিল, 'ত্থাখ্ সুকু, পরশু আমরা আমাদের পুতুলের বিয়ে দেবো।'

সুকুমারীর আপত্তি কিছুই নাই। সুরবালা যাহা বলিবে তাহাই হইবে।

প্রথমে ঠিক হইয়াছিল, সুকুমারীর মেয়ে, সুরবালার ছেলে।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সে-মত পাল্‌টাইয়া গেল।

সুরবালা বলিল, 'না ভাই, তুই তো গরীব, মেয়ের বিয়েতে খরচ করতে হয়, তুই তো খরচ করতে পারবি না।'

সুকুমারী বলিল, 'হ্যাঁ ভাই, ঠিক বলেছিস্। আমি পাবো কোথায়? আমার মাও নেই, বাবাও নেই।'

বলিতে গিয়া চোখ দুইটা তাহার জলে ভরিয়া আসিল।

সুরবালা তাহা লক্ষ্য করিল। বলিল, 'তাহ'লে তোর ছেলে, আমার মেয়ে।'

সুকুমারী মুখে কিছুই বলিতে পারিল না। ঘাড় নাড়িয়া তাহার সম্মতি জানাইল।

সুরবালা বলিল, 'জামাটা কিন্তু পরিষ্কার করবি। ছেলের বিয়ে—ময়লা জামা পরা চলবে না। সাবান তো তোকে দিয়েছি।'

সুকুমারী কি বলিবে কিছুই বুঝিতে পারিল না। এই সেদিন সে তাহাকে একটা আস্ত সাবান দিয়াছে, ইহারই মধ্যে ফুরাইয়া গিয়াছে বলা চলে না। সত্য কথা বলা ছাড়া উপায় নাই। বলিল, 'তুই সেদিন যে সাবানটা দিয়েছিলি, সেটা ভাই—'

সুকুমারী একটা ঢোঁক গিলিল।

সুরবালা বলিল, 'ফুরিয়ে গেছে?'

—'না। রেখেছিলাম এক জায়গায়। খুঁজে পাচ্ছি না।'

সুরবালা বলিল, 'তাহ'লে ঠিক তোর বৌদি চুরি করে' নিয়েছে।'

সুকুমারী চুপ করিয়া রহিল।

হয়তো আবার আর-একটা সাবান সুরবালা তাহাকে দিত, কিন্তু তাহার মা দিল সব গোলমাল করিয়া।

পুতুলের বিয়ে হইবে শুনিয়া মা বলিলেন, 'বেশ তো, আমি সব ঠিক করে' দেবো।'

সুরবালা বলিল, 'কিন্তু মা, সুকুর ওই একটিমাত্র ছেঁড়া জামা। ওই ছেঁড়া জামা পরে' ছেলের বিয়ে দিতে আসবে?'

মা বলিলেন, 'না রে বোকা মেয়ে, ফ্রক্ পরে' বেয়ান্ আসবে বেয়ানের বাড়ী, তা হয় না। সেদিন শাড়ী পরতে হবে।'

সুরবালা বলিল, 'শাড়ী ও পাবে কোথায় মা?'

মা বলিলেন, 'আমি দেবো।'

সুরবালা আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেল। হাসিয়া বলিল, 'হ্যাঁ মা, তাহ'লে ভাল হয়। সুকুর একটা শাড়ী, আমার একটা শাড়ী। বাস্, কি মজা!'

বিবাহের দিন পাল্‌টাইয়া গেল। মা সব ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। বাড়ীর সরকারকে ফর্দ্দ করিয়া বাজার পাঠাইলেন।

বিবাহের যাবতীয় যা-কিছু প্রয়োজন সবই আসিল।

বর-পুতুল কনে-পুতুল হইতে আরম্ভ করিয়া দুই বেয়ানের

জন্য নূতন জামা আসিল, নূতন শাড়ী আসিল। গায়ে-হলুদের তত্ত্ব, বৌ-ভাতের সাজ-সরঞ্জাম, ছোট ছোট কাঠের তৈরি টেবিল, চেয়ার, আলমারি আর খাট-বিছানা, কিছুই বাদ পড়িল না।

মহা সমারোহে সুকুমারীর ছেলের সঙ্গে সুরবালার মেয়ের বিবাহ হইল।

সুকুমারীর দাদা-বৌদিদির কাছে একটা খবর পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

দাদা বাড়ীতে ছিল না। বৌদিদি ভাবিল, সুকুমারী এখন বাড়ী ফিরিবে না। কেন ফিরিবে না, কতদিন ফিরিবে না, কোনও কিছুই সে জানিতে চাহিল না। মেয়েটা এখন সুরবালাদের বাড়ীতে থাকিবে শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া কেমন যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল।

এদিকে পুতুলের বিবাহে অনুষ্ঠানের ত্রুটী কিছুই হইল না।

সুরবালার মা নিজের হাতে সবকিছু ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সারা বাড়ী উৎসবের আনন্দে মাতিয়া উঠিল।

পাড়া-প্রতিবেশী কাহাকেও অবশ্য নিমন্ত্রণ করা হইল না।

মা বলিলেন, 'না বাছা, আমাদের গাঁয়ের লোকগুলো ভাল নয়। এই নিয়ে কত লোক কত কথা বলবে, হাসি-রহস্য করবে, হয়তো টিট্‌কিরি দেবে।'

তাই বলিয়া লোকজনের অভাব কিছু হইল না। বাড়ীতে দাসদাসী, সরকার, ম্যানেজার, আত্মীয়স্বজনের সংখ্যাও বড়

কম নয়। তাহারাই হইল কন্যাযাত্রী, তাহারাই হইল বর-যাত্রী। তিন-চারদিন ধরিয়া সকলে মিলিয়া পরমানন্দে ভোজন করিতে লাগিল।

যাহাদের লইয়া এই উৎসবের আয়োজন, সুরবালার মা তাহাদের নিজের হাতে সাজাইলেন, তাহার পর ভাল করিয়া চুল বাঁধিয়া দিয়া, নূতন জামা নূতন কাপড় পরাইয়া, মেয়ে-জামাইকে কেমন করিয়া ঘরে তুলিতে হয়, কেমন করিয়া বাসর জাগাইতে হয়—এইসব শিখাইয়া দিলেন।

কিন্তু মেয়েদের একটুখানি জ্ঞানবুদ্ধি হইলেই এ-সব ব্যাপার শিখাইতে হয় না। ফ্রক্ ছাড়িয়া শাড়ী পরিবামাত্র হঠাৎ কেমন করিয়া না জানি তাহারা পাকা গৃহিণী হইয়া ওঠে।

এবারেও ঠিক তাই হইল।

সুরবালা আর সুকুমারী ঘুরিয়া-ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল, যেন সাতছেলের মা।

সন্ধ্যায় বিবাহ চুকিয়া গেল। তাহার পরেই বর-কনে ঢুকিল গিয়া বাসর-ঘরে। কিন্তু সারাদিন ঘুরিয়া-ফিরিয়া দুই বেয়ান্ এমনি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, বাসর-ঘরে দেখা গেল, তাহারা দু'জনে পাশাপাশি শুইয়া হঠাৎ কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

এম্‌নি প্রত্যহ।

মিথ্যা দুটা পুতুল লইয়া বিবাহের ঘটা আর কতদিন চলে?

মা বলিলেন, 'এবার থাক্ বাছা। খুব বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে।'

কিন্তু ঝি-চাকর কর্ম্মচারীরা থামিতে চায় না।

বাড়ীতে এমনি একটা হট্টগোল গোলমাল যতদিন চলিবে ততই ভাল।

গিন্নি-মা'র খাস্-পরিচারিকা একটা কথা তুলিল। বলিল, 'ওদের সই পাতিয়ে দাও মা।'

মা বলিলেন, 'তাই দে।'

বিবাহের পর সই পাতানোর ঘটা চলিল একদিন।

তাহার পর আর কোনও ছুতাতেই উৎসবটাকে বাড়ানো সম্ভব হইল না।

সুরবালা এখন আর সুকুমারীকে নাম ধরিয়া ডাকে না। বলে, 'সই।'

সুকুমারীও সুরবালাকে বলে, 'সই।'

কিন্তু সারাদিন পুতুল লইয়া খেলা করিলে চলিবে না। আজকালকার দিনে একটুখানি লেখাপড়া না শিখিলে লোকে নিন্দা করিবে। সুরবালার মা বলিল, 'কাল থেকে সরকারের কাছে দু-বেলা বসবি বই নিয়ে। সরকারকে আমি বলে' দিচ্ছি।'

সরকারকে বলিয়া দেওয়া হইল এবং সরকার নিজেই তাহাকে টানিয়া লইয়া গিয়া বই-শ্লেট লইয়া বসাইতে লাগিল।

আজ শুভদিন

সুকুমারীর বইও নাই, শ্লেটও নাই। সইএর পাশটিতে গিয়া চুপ করিয়া বসে, সইএর পড়া শোনে, লেখা দেখে, তাহার পর একসময় চুপি চুপি বলে, 'আমি চললুম সই। আবার বিকেলে আসবো।'

সরকারের ভয়ে সুরবালা কিছু বলিতে পারে না। ঘাড় নাড়িয়া বলে, 'যা।'

এমনি করিয়া সুকুমারীর আসা-যাওয়া কমিতে লাগিল।

সরকার সেদিন সুকুমারীকে ডাকিয়া বলিল, 'তোমার দাদাকে বোলো—মাসে মাসে আমাকে পাঁচটি করে' টাকা যদি দেয় তো তোমাকেও আমি পড়াতে পারি।'

দাদার অবস্থা সুকুমারী জানে। তবু একদিন সে তাহার দাদাকে বলিয়া বসিল। বলিল, 'দাদা, সুরোর মাষ্টার বলছিল, মাসে পাঁচটি করে' টাকা পেলে সে আমাকে পড়াবে।'

সুকুমারীর দাদা কথাটা ভাল বুঝিতে পারে নাই। জিজ্ঞাসা করিল, 'কি বললি?'

সুকুমারীর বৌদিদি আড়ালে দাঁড়াইয়া সবই শুনিয়াছিল। চীৎকার করিয়া সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

—'কি বললি? লেখাপড়া শিখবি?'

সুকুমারী হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল।

—'চুপ করে' রইলি কেন, বল্! দাদার টাকা দেখেছিস্ বুঝি? বড়লোক বন্ধু রয়েছে তোর—তাকে বল্ না! মাসে মাসে টাকা দিতে হবে তোর দাদাকে?'

দাদা বলিল, 'ওকে ওরকম করে' বলছো কেন? ওর কি দোষ!'

বৌদিদি বলিল, 'ওর দোষ নয় তো কার দোষ? সাত-দিন রইলো ওদের বাড়ীতে। কি? না—পুতুলের বিয়ে দিচ্ছে! ওর কি পুতুলখেলার বয়েস? ওই বয়েসে গাঁয়ের মেয়েরা ঘর-সংসারের কত কাজ করে। আর উনি এখনও খেলা করে' বেড়াচ্ছেন। ছাখো, সত্যি বলছি—ও যদি এমনি করে' দিন কাটায়, ওর দুর্গতির কিচ্ছু বাকি থাকবে না—এই আমি বলে' রাখলাম দেখো।'

দাদা বলিল, 'তা বেশ তো, ওকে কি করতে হবে তাই বলো। ও তাই করবে।'

বৌদিদি বলিল, 'হ্যাঁ করবে! আমার কথা শুনবে কি না! বন্ধু ডাকতে পাঠাবে আর ফুড়ুৎ করে' পালাবে বাড়ী থেকে।'

—'না না, পালাবে না।'—দাদা বলিল, 'না রে স্কু, আমরা গরীবমানুষ, ওরা বড়লোক। ঘর-সংসারের কাজকর্ম্ম না শিখলে চলবে কেন? আমি তো বড়লোকের বাড়ীতে তোর বিয়ে দিতে পারবো না। সেখানে গিয়ে তোকে ভাত রাঁধতে হবে, কাজ করতে হবে।'

বৌদিদির কিন্তু এ-সব কথা ভাল লাগিল না। বলিল, 'কাকে কি শেখাচ্ছো তুমি! থামো।'

দাদার এবার অসহ্য হইয়া উঠিল। চীৎকার করিয়া বলিল, 'তুমি থামো।'

বৌদিদি থামিবার মেয়ে নয়। সেও তৎক্ষণাৎ তাহার সুর বাড়াইয়া দিল। বলিল, 'কেন, থামবো কেন? আমার কথা বুঝি বিশ্বাস হলো না? আমি মিছে কথা বলছি—না? আচ্ছা দেখো তবে এবার তোমাকে দেখিয়ে দেবো।'

কি দেখাইয়া দিবে স্পষ্ট করিয়া কিছুই সে বলিল না।

সুকুমারী কিন্তু তাহার পরদিন হইতে সুরবালাদের বাড়ী যাওয়া বন্ধ করিয়া দিল।

সুরবালার ঝি ডাকিতে আসিল। সুকুমারী বলিল, 'আজ আমি যেতে পারবো না ঝি, তুমি বলে' দিও সুরোকে।'

বৌদিদি কথাটা শুনিতে পাইল। বলিল, 'কেন, যাবিনি কেন, যা না। ডেকে পাঠিয়েছে যখন, যা। তোর দাদা কিছু বলবে না, আমি বলে' দেবো বুঝিয়ে।'

এই বলিয়া বৌদিদিই তাহাকে একরকম জোর করিয়াই পাঠাইয়া দিল।

পাঠাইয়াও দিল, আবার তাহার দাদা আসিলে তাহাকে বলিয়াও বসিল, 'কেমন? বলেছিলাম না! ও কি থাকতে পারে কখনও! ওর নেশা ধরে গেছে যে!'

দাদা তাহার চুপ করিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল।

আজ শুভদিন

বৌদিদি বলিল, 'ভাবছো কি? তাড়াতাড়ি ওর একটি বিয়ে দিয়ে দাও।'

—'বিয়ে!'—দাদা মুখ তুলিয়া তাকাইল।

—'হ্যাঁ, বিয়ে! অবাক্ হয়ে গেলে নাকি?'

—'কিন্তু টাকা? টাকা কোথায় পাবো?'

বৌদিদি বলিল, 'দিতে চাও যদি তো বলো তাহ'লে আমার পিসিমাকে বলি একটি পাত্র দেখতে। টাকার ব্যবস্থা যেমন করে' হোক্ হয়ে যাবে।'

সুকুমারীর এখনও বিয়ের বয়েস হয় নাই। কাজেই বিবাহের কথা তাহার দাদা কোনোদিন ভাবিতেও পারে নাই।

তাহার এক পিসিশাশুড়ী বিয়ের ঘটকালি করে তাহা সে জানে। তাহাকে বলিলে যদি একটি মনের মত পাত্রের সন্ধান হয় তো মন্দ কি? স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিল, 'পাত্রের সন্ধান তো একদিনে হয় না। তা বেশ তো, বলো তোমার পিসিকে। দেখুক্ একটি ছেলে।'

বৌদিদির পিসিমা এই গ্রামেরই বৌ। বিবাহের পরেই বিধবা হইয়া পরমানন্দে এই গ্রামেই বাস করিতেছে। বিবাহের ঘটকালি করিয়া উপার্জ্জনও সে মন্দ করে না।

বৌদিদি বলিল, 'তোমার বোনটি তো দেখতে-শুনতে মন্দ নয়। ওকে যে দেখবে তারই পছন্দ হবে।'

এই কথাটাই দাদার মনের কথা। বলিল, 'তা সত্যি।'

বৌদিদি বলিল, 'কিন্তু ছাখো, সুকু যদি এম্নি ট্যাং ট্যাং

করে' এর বাড়ী ওর বাড়ী ঘুরে বেড়ায় তাহ'লে তো চলবে না। ঘরকন্নার কাজকর্ম্ম তো করতে হবে।'

দাদা বলিল, 'সেকথা তুমি তাকে বললেই তো পারো।'

বৌদিদি বলিল, 'আমি বললে শুনবে তোমার বোন? তুমি বোলো।'

—'আমি তো বলেছি সেদিন। আচ্ছা, আবার বলবো।'

বলিবার কথা দাদার মনে ছিল না।

মনে যেদিন পড়িল সেদিন তাহার মনে না পড়িলেই যেন ভাল হইত।

কি একটা ঘর-গৃহস্থালির ব্যাপার লইয়া দাদা-বৌদিদিতে সেদিন দারুণ ঝগড়া।

সেই ঝগড়ার মুখেই দাদা দেখিল, সুকুমারী তাহার চোখের সুমুখ দিয়া পার হইয়া যাইতেছে। তৎক্ষণাৎ সে চীৎকার করিয়া উঠিল, 'এই যে হতভাগা মেয়ে, এত যে বলেছি, শুনেছে আমার কথা?'

দাদার কি কথা সে শুনে নাই জানিবার জন্য থমকিয়া থামিল।

দাদা বলিল, 'খবরদার বলছি ট্যাং ট্যাং করে' ঘুরে বেড়াবি না। বাড়ীতে থাকবি, বৌদিদির কাজে সাহায্য করবি। ফের যদি শুনেছি কোনোদিন তুমি ওই বড়লোকের বাড়ী গেছ তো ঠেঙ্গিয়ে তোমার পা আমি খোঁড়া করে' দেবো।'

দাদার মুখের উপর কোনও কথা সুকুমারী কোনোদিন বলে নাই। আজও সে কিছুই বলিতে পারিল না। মাথা হেঁট করিয়া নীরবে সম্মতি জানাইয়া দাদার চোখের সুমুখ হইতে সরিয়া গেল।

তাহার ফল হইল এই যে, তারপর যেদিন সুরবালার বাড়ী হইতে ঝি আসিল, সেদিন সে স্পষ্ট তাহার মুখের ওপরেই বলিয়া বসিল, 'আমি আর ওদের বাড়ী যাবো না ঝি। কোনোদিন যাবো না।'

ঝি ভাবিল, বুঝি তাহাদের ঝগড়া-ঝাঁটি হইয়াছে। তাই সে অনেক করিয়া তাহাকে বুঝাইতে লাগিল, 'খেলা করতে গিয়ে ওরকম ঝগড়া-ঝাঁটি কত হয়! চলো, রাগ করতে নেই।'

কিন্তু রাগ যে সে করে নাই, সুরবালার সঙ্গে তাহার ঝগড়া-ঝাঁটি কিছুই হয় নাই—সেকথা অনেক করিয়াও সুকুমারী তাহাকে বুঝাইতে পারিল না।

ঝি সেই এককথা ধরিয়া রহিল, 'না তুমি চলো। তোমাকে না নিয়ে যেতে পারলে খুকুমণি আমাদের কান্নাকাটি করবে।'

বৌদিদি আড়ালে দাঁড়াইয়া সবই শুনিতেছিল। এইবার সে নিজে আগাইয়া আসিল। বলিল, 'তবে শোনো বাছা, তুমি ওদের বাড়ীর পুরনো ঝি, তুমি বুঝিয়ে কথাটা বলতে পারবে তাই তোমাকেই বলছি। সুকুমারীকে ওর দাদা বারণ করেছে তাই ও যেতে চাচ্ছে না।'

ঝি বলিল, 'বারণ করেছে কেন মা?'

বৌদিদি বলিল, 'আমরা তো বড়মানুষ নই মা, আমরা গরীব। ও যদি এই বয়েস পর্য্যন্ত বড়লোক বন্ধুর সঙ্গে পুতুল খেলে কাটায়, ঘরের কাজকর্ম্ম কিছু না শেখে, না করে, বিয়ের পর গরীব শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে ও যে খুব বিপদে পড়বে মা। তবে হ্যাঁ, বড়লোক বন্ধুর মা যদি সুকুমারীর দাদাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলে, এই নাও তোমার বোনের বিয়ের জন্য দিলাম এই পাঁচ-দশ হাজার টাকা, কি লিখে দিলাম এই দশ-কুড়ি বিঘে জমি, তাহ'লে যাক্ না, কে বারণ করেছে যেতে? কই, তুমিই বলো তো মা—ঠিক বলেছি কি না?'

ঝি তাহার মনের কথা বুঝিল। ইহার উপর আর কথা চলে না। বলিল, 'বেশ, তাই বলবো গিয়ে।'

বৌদিদি বলিল, 'হ্যাঁ বাছা, তুমি ভারিক্কি মানুষ, তাই তোমাকে সব খুলে বললাম। তুমি গিন্নিমাকে গিয়ে বোলো।'

—'বলবো।' বলিয়া ঝি চলিয়া গেল।

সেই যে গেল, আর কোনোদিন কেহ আসিল না।

সুরবালার মা বুঝিল সুকুমারীর বৌদিদির মনের বাসনা। কিন্তু সুরবালা ছেলেমানুষ, না বুঝিয়া মাঝে মাঝে সে ঝোঁক ধরিয়া বসিত—'সুকুমারীকে ডেকে পাঠাই মা, অনেক-দিন আসেনি।'

সুরবালাকে একটিবার দেখিবার জন্য সুকুমারীর মনও

উতলা হইয়া উঠিত। কিন্তু সেকথা সে কাহাকে বলিবে? দাদার নিষেধ, বৌদিদির নিষেধ, মনের কথা মনেই চাপিয়া রাখা ছাড়া উপায় নাই।

সুকুমারী ঘর-সংসারের কাজকর্ম্ম করে। বৌদিদি বলে, 'এমনি করে' কাজ করতে শেখ্, নইলে বিয়ের পর শ্বশুর-বাড়ীতে গিয়ে শাশুড়ী-ননদের মুখ-ঝাম্টা খেতে হবে।'

এই বলিয়া ভারি ভারি কাজের ভার সুকুমারীর উপর ফেলিয়া দিয়া বৌদিদি নিশ্চিন্ত হইয়া বলে, 'এইবার তোর দাদাকে বলি, তোর জন্যে একটি পাত্তর দেখুক্।'

কথাটা সে মিথ্যা বলে না।

কয়েকদিন পরেই দেখা যায়, সুকুমারীর দাদা সুকুমারীর বিবাহের জন্য পাত্রের সন্ধান করিতেছে। এ-গ্রাম সে-গ্রাম—যেখানে শুনিতেছে বিবাহযোগ্য ছেলে আছে, সেইখানেই ছুটিতেছে।

কিন্তু ছুটাছুটিই সার হইতেছে। সব ঠিক হইয়াও একটা-না একটা জায়গায় আট্‌কাইয়া যাইতেছে।

কোথাও ছেলে ভাল তো খাবার সংস্থান নাই। কোথাও-বা খাবার সংস্থান আছে তো ছেলেটি কদাকার কুৎসিত।

সুকুমারীর দাদার ইচ্ছা—একটিমাত্র ছোট বোন, মা তাহাকে বড় ভালবাসিত, মেয়েটা দেখিতেও অত্যন্ত সুন্দরী, যেখানে-সেখানে যেমন-তেমন করিয়া তাহার বিবাহ দেওয়া উচিত হইবে না।

কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য, সাধ থাকিলেও তাহার সাধ্য নাই। বোনের বিবাহে সে বেশি খরচ করিতে পারিবে না। অথচ কুলিন ব্রাহ্মণের মেয়ে, যেখানেই যায়, বরপণের দাবীটা এমন বেশি করিয়া বলিয়া বসে যে, বেচারা ভাবিয়া সারা হয়, কেমন করিয়া বোনের বিবাহ দিবে বুঝিতে পারে না।

এমনি করিয়া তিন-চারটি বছর কাটিয়া গেল। কোথাও কোনও ব্যবস্থাই হইল না।

না-হইবার কারণ—সুকুমারীর বৌদিদি কুমু ছিল সন্তান-সম্ভবা। মাস-দুই আগে তাহার একটি ছেলে হইয়াছে।

এতদিন পরে কুমুর ছেলে হইল। আনন্দের কথা। কিন্তু কিছুদিন হইতে কুমুর শরীরটা মোটেই ভাল যাইতেছিল না। সুকুমারীকেই ঘর-সংসারের যাবতীয় কাজ নিজের হাতে করিতে হইয়াছে।

একদিকে সংসারের কাজ, আর একদিকে বৌদিদির সেবাযত্ন।

বৌদিদি বলে, 'ছ্যাখ্, এইসব কাজকর্ম্ম করতে যদি না শিখতিস্, আজ কি হতো বল্ দেখি! ভাগ্যিস্ তখন আমি তোকে বড়লোকের বাড়ী যেতে দিইনি।'

সুকুমারী মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। হঠাৎ সুরবালাকে তাহার মনে পড়িয়া যায়। মনে হয়, ছুটিয়া গিয়া তাহাকে একটিবার দেখিয়া আসে। এতদিন হয়তো-বা

সে তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছে। হয়তো-বা সে তাহার উপর রাগ করিয়াছে।

কিন্তু আসল কথাটা সুরবালা যদি জানিত! যদি জানিত সে কতখানি অসহায়া!

হয়তো-বা সারা জীবনেও তাহা সে জানিবে না। লেখা-পড়াও শিখিল না যে তাহাকে সে চিঠি লিখিয়া জানাইয়া দিবে।

ওদিকে সুকুমারীর দাদার মনের অবস্থা তখন খুব খারাপ।

স্ত্রীর অসুখের জন্য ডাক্তারে কবিরাজে তাহার অনেক টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে। দু'বিঘা ধানের জমি তাহাকে বিক্রি করিতে হইয়াছে।

এদিকে নবোদ্ভিন্নযৌবনা সুকুমারীর দিকে আর তাকানো যায় না। আগুনের মত রূপ যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ফাটিয়া পড়িতেছে।

এবার যেমন করিয়াই হোক্, বিবাহ তাহার দিতেই হইবে। না দিলে লোকে নিন্দা করিবে।

সেদিন কি ভাবিয়া হঠাৎ সে তাহার স্ত্রীর কাছে গিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'এখন তোমার শরীরটা ঠিক সেরে গেছে, না কি বলো?'

হঠাৎ এরকম প্রশ্ন কুমু প্রত্যাশা করে নাই। বলিল, 'কেন বলো দেখি ?'

—'এম্‌নিই জিজ্ঞাসা করছিলাম।'

—'না, এম্‌নি নয়। বলো তুমি কেন আমাকে ও-কথা জিজ্ঞাসা করলে ?'

রাখাল তাহার মনের কথা খুলিয়া বলিল। বলিল, 'সুকুকে আর রাখা যায় না।'

অতি-বড় সত্য কথা।

কুমু বলিল, 'তাই বলো। ভাবছো বুঝি সুকুমারী চলে গেলে ঘর-সংসারের কাজকর্ম্ম কে করবে।'

রাখাল বলিল, 'হ্যাঁ। তার ওপর কোলে তোমার কচি ছেলে।'

কুমু বলিল, 'তা হোক্। সেজন্যে ভেবো না। কিন্তু বিয়ে যে দেবে—পাত্র কোথায় ?'

—'পাত্র একটি আছে। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়েস। আদমপুরে বাড়ী।'

কুমু বলিল, 'তোমার টাকা কোথায় ?'

রাখাল বলিল, 'ছেলেটি টাকা চায় না।'

কুমু বলিল, 'এক্ষুনি দিয়ে দাও। এ-পাত্র হাতছাড়া কোরো না।'

—'কিন্তু'···বলিয়া রাখাল কি যেন ভাবিতে লাগিল।

—'ভাবছো কি ?'

—'পাত্রটি লেখাপড়া জানে না।'

কুমু বলিল, 'তোমার বোনটি বুঝি পণ্ডিত?'

রাখাল চুপ করিয়া রহিল।

কুমু বলিল, 'ভালই হবে। পুরুষমানুষ—লেখাপড়া কিছু না জানলেও বাংলায় চিঠিটা-পত্রটা লিখতে-পড়তে পারবে, তোমার বোন তাও পারবে না।'

রাখাল বলিল, 'বাবুদের বাড়ী তখন যেতে দিলাম না। দিলে হয়তো লেখাপড়া কিছু শিখতো।'

কুমু বলিল, 'না, লেখাপড়া শিখতো না। বড়লোক বন্ধুর খোসামুদি করতে শিখতো। তার চেয়ে ভালই হয়েছে, আমার কাছে থেকে আমাদের মতন গরীব-গেরস্ত-বাড়ীতে সবচেয়ে যা বেশি দরকার তাই শিখেছে। ভাত রাঁধতে শিখেছে, কম পয়সায় সংসার চালাতে শিখেছে।'

রাখাল বলিল, 'তাহ'লে এইখানেই দিয়ে দিই। আর ভাবতে পারি না।'

কুমু বলিল, 'না আর ভাবতে হবে না।'

আজ শুভদিন

*

*   *

শেষ পর্য্যন্ত তাহাই হইল।

আদমপুরেই সুকুমারীর বিবাহ হইবে, পাকাপাকি ব্যবস্থা হইয়া গেল।

গরীব দাদা—বিশেষ কিছু আয়োজন করিতে পারিল না।

সুকুমারী ভাবিয়াছিল, দাদা তাহার সুরবালাদের বাড়ী নিশ্চয়ই নিমন্ত্রণ করিবে। তাহার বিবাহের সময় সুরবালা থাকিবে না—ইহা সে ভাবিতেই পারে না।

কিন্তু যখন সে দেখিল, বাবুদের বাড়ীর নাম পর্য্যন্ত কেহ উচ্চারণ করিল না, সুকুমারী তখন লজ্জা-শরমের মাথা খাইয়া তাহার দাদার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'দাদা, সুরবালাকে একটা খরব দিলে হতো না?'

সুকুমারীর কোনও অনুরোধই রাখাল কোনোদিন প্রত্যাখ্যান করে নাই। বলিল, 'বেশ। আজই খবরটা দিয়ে দেবো। আমি নিজে গিয়েই বলে' আসছি।'

কুমু ঠিক সময়টিতেই আসিয়া হাজির হইল। কোথায় ছিল কে জানে, পেছন হইতে বলিয়া উঠিল, 'দাদার সঙ্গে লুকিয়ে লুকিয়ে কি পরামর্শ হচ্ছে?'

দাদাই কথাটার জবাব দিল। বলিল, 'বাবুদের বাড়ীতে একটা খবর দিতে বলছে।'

কুমু ঠোঁট উল্‌টাইয়া সে এক অদ্ভুত মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, 'ও শুধু নামেই বাবুদের বাড়ী, মুখেই বড়লোক বন্ধু! দিতে-থুতে জানে না! ঝি-চাকরাণীর মতন পেছু পেছু ঘুরে বেড়াও আর খোসামুদি করো।'

বৌদিদি যে ঠিক এই সময় আসিয়া পড়িবে সুকুমারী তাহা ভাবে নাই। মুখখানি তাহার শুকাইয়া গেল। ভাবিল, বৌদিদি নিশ্চয়ই খবর দিতে নিষেধ করিবে। বৌদিদি নিষেধ করিলে দাদার যাইবার ক্ষমতা নাই।

কিন্তু ভগবান বুঝি রক্ষা করিলেন।

বৌদিদি বলিল, 'তা বলছে যখন, যাও একবার। ছেলে-বেলার বন্ধু, ওর মাকে গিয়ে বোলো, সুরবালাকে যেন একটিবার পাঠিয়ে দেয়।'

সুকুমারীর মুখে হাসি ফুটিল। কতদিন সুরবালাকে সে দেখে নাই। শ্বশুরবাড়ী যাইবার আগে তবু একটিবার তাহাকে সে দেখিতে পাইবে।

সুকুমারী তাহারই প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

হলুদ-ছোপানো একখানি শাড়ী পরাইয়া সুকুমারীর কপালে কনে-চন্দনের ফোঁটা কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। রাত্রির প্রথম প্রহরে বিবাহের লগ্ন। পাড়া-পড়শী মেয়েরা আসিয়াছে। সুকুমারীকে মনে হইতেছে যেন স্বর্গের অপ্সরা। যেমন

গায়ের রং, তেমনি দেহসৌষ্ঠব। গরীবের বাড়ীতে এত সুন্দরী মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না। গ্রামের মধ্যে সেরা সুন্দরী সুকুমারী। সুরবালাও কম সুন্দরী নয়, কিন্তু সুকুমারী তাহার পাশে গিয়া দাঁড়াইলে তাহার রূপও ম্লান হইয়া যায়।

আজ সারাটা দিন সুকুমারী কান খাড়া করিয়া বসিয়া আছে। নূতন কেহ আসিলেই চট্ করিয়া সে বলিয়া উঠিতেছে, 'কে?'

পাড়ার একটা মেয়ে তাহার এই ছট্‌ফটানি দেখিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিয়া উঠিল, 'থাম্ থাম্, অত ছট্‌ফট্ করিস না। যে আসছে সে চুপি চুপি আসবে না, ঢাক-ঢোল বাজিয়ে পাল্‌কি চড়ে আসবে।'

কথাটা শুনিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিল। হাসিল না শুধু তাহার বৌদিদি কুমু। সে বুঝিল কেন তাহার এই ব্যাকুলতা। কাহার আগমন প্রতীক্ষায় আজ সে এমন উতলা হইয়া উঠিয়াছে।

কুমু তাহাকে শুনাইয়া-শুনাইয়াই বলিতে লাগিল, 'আর আসবে না। আর আসে কখনও। আসবার হ'লে বিকেলে আসতো।'

সুকুমারীর মুখখানি ম্লান হইয়া গেল। সেও ঠিক সেই সন্দেহই করিতেছিল। এতক্ষণ পরে চোখ দুইটা তাহার জলে ভরিয়া আসিল। লুকাইয়া চোখের জল মুছিবার জন্য সেখান হইতে সে সরিয়া গেল।

ঘরের বাহিরে আসিতেই দাদার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা।

সুকুমারীকে দেখিয়াই তাহার দাদা বলিয়া উঠিল, 'এই ছাখ্, কথাটা তোকে বলতে ভুলেই গেছি। আমি গিয়েছিলাম বাবুদের বাড়ী। কেউ নেই এখানে। হাজারিবাগ চলে গেছে চেঞ্জে।'

সুকুমারী বলিল, 'সুরো নেই এখানে?'

রাখাল বলিল, 'না। সেও নেই, তার মাও নেই। সব চলে গেছে। মাস-দুই পরে আসবে বললে। যেখানেই থাক্, খবরটা আমি জানিয়ে দিতে বললাম।'

দাদা চলিয়া যাইতেই সুকুমারী একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। মনে মনে বলিল, 'সুরবালা নেই এখানে। থাকলে সে নিশ্চয়ই আসতো।'

*

*   *

সুকুমারীর স্বামী পঞ্চানন—পরম সুন্দর সুপুরুষও নয়, আবার দূর-ছাই করিবার মত বিশ্রীও নয়। স্বাস্থ্যবান সুগঠিত দেহ, শুধু বয়স একটু বেশি। বেশি হইবার কারণ অবশ্য আছে। পঞ্চাননের সংসার একেবারে ফাঁকা। বাপ-মা অনেক আগেই মরিয়াছে, ভাইও নাই, বোনও নাই। মাটির

একখানি বাড়ী আর সে নিজে। বিবাহ করিয়া সংসারী হইবার ইচ্ছা তাহার অনেকদিনের, চেষ্টাও সে কম করে নাই, কিন্তু বিবাহের সম্বন্ধ যখনই আসিয়াছে, গ্রামের লোক ভাঙাইয়া দিয়াছে।

পঞ্চানন যদি বিবাহ করিয়া সংসারী হয়, ক্ষতি কাহারও নাই, তবু কেন জানি না, পাড়া-প্রতিবেশীর বুক চড়্‌চড়্‌ করে, রাত্রে ভাল ঘুম হয় না, এই লইয়া যেখানে-সেখানে আলোচনা চলে। বলে, 'ভাল রোজকার করছে আজকাল, বিয়ে কেন করবে না বলো।'

অথচ রোজগার তাহার এমন কিছুই নয়।

আদমপুর গ্রামের গা ঘেঁসিয়া রেলের ছোট একটি ব্রাঞ্চ লাইন পার হইয়াছে। কাছেই আদমপুর ষ্টেশন। এই ষ্টেশনে পঞ্চানন একটি দোকান করিয়াছে।

গ্রামে যাহারা বেকার বসিয়া থাকে, তাহাদের রোজগারের কোনও পন্থা নাই—তাহারাই বলে দোকান।

অথচ দোকান ঠিক নয়। আদমপুরের চারিদিকে কয়লার খনি। আর সেইজন্যই জায়গাটার এত কদর, এত জমজমাট। আদমপুর রেল-ষ্টেশনের পাশে তিনটি ছোট ছোট কয়লার ডিপো চলে। ডিপোর মালিক অবশ্য আদমপুর গ্রামের লোকেরই হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু যাহা উচিত অনেক সময় তাহা হয় না। তাহারা বলে নাকি কয়লার ময়লা ঘাঁটাঘাঁটির

কাজ তাহাদের নয়। ও-কাজ যাহাদের পোষায় তাহারাই করে। তিনটি ডিপোই অবাঙালীর।

পঞ্চানন তাহাদেরই একজনকে ধরিয়া ডিপোর পাশে একটুখানি জায়গা পাইয়াছে। টিন দিয়া ঘিরিয়া ছোট একটি ঘরের মত করিয়া লইয়াছে। এইটিই পঞ্চাননের দোকান। ছোট একটি উনান ছাড়া দোকানে আসবাবপত্র বলিতে কিছুই নাই।

পঞ্চানন একা মানুষ। অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করে। পুকুরে স্নান করিয়া নিজেই এক কলসী জল আনিয়া বাড়ীতে রাখিয়া দেয়। তাহার পর ঘর-দোর বন্ধ করিয়া তালাচাবি দিয়া ষ্টেশনে চলিয়া যায়। গ্রামের একটি বারো-তেরো বছরের ছেলের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়াছে। ছেলেটি তাহার আগেই ষ্টেশনে গিয়া দোকানের ঝাঁপ তুলিয়া উনানে আগুন দেয়, তাহার পর ডিপোর মালিক সূরযুনারাণের বাড়ী হইতে কাঠের বারকোষ, কুমড়ার ফালি আর তেলের টিন ইত্যাদি আনিয়া বেসন মাখিতে বসে।

তেলেভাজা আর চায়ের দোকান।

সারাটা দিন পঞ্চানন এইখানেই কাটায়। ছেলেটার নাম টোটা। তেলেভাজার উনানে ভাত চড়াইবার আগে পঞ্চানন জিজ্ঞাসা করে, 'হ্যাঁরে টোটা, আজ এইখানেই খাবি, না বাড়ী যাবি?'

বিধবা মায়ের একটিমাত্র সন্তান টোটা। সবদিন এখানে

খাইতে চায় না। এক-একদিন গ্রামে গিয়া মার কাছে খাইয়া আসে। সেদিন সে দু-আনা বেশি পায়।

ষ্টেশনে ট্রেণ আসিয়া দাঁড়াইলে যাত্রীদের কাছে টোটা মাটির ভাঁড়ে চা বিক্রি করিয়া আসে। সারাদিনে ছ-খানা ট্রেণ। তিনখানা যায়, তিনখানা আসে। রাত্রে ট্রেণের পালা চুকাইয়া দিয়া দু-জনেই গ্রামে চলিয়া যায়। টোটাকে প্রত্যহ দিতে হয় দু' আনা পয়সা।

এই আমাদের পঞ্চানন। সুকুমারীর স্বামী।

বিবাহের আগে সুকুমারীকে পঞ্চানন দেখে নাই। দেখিতে চায়ও নাই।

আদমপুরে একটি পাত্র আছে শুনিয়াই রাখাল আসিয়াছিল পঞ্চাননকে দেখিতে। সকালের ট্রেণে নামিয়াছিল আদমপুর ষ্টেশনে। গ্রাম হইতে পঞ্চানন তখন সবেমাত্র আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

ষ্টেশন-মাষ্টার পঞ্চাননকে ডাকিয়া দিয়াছিলেন। ষ্টেশনের বেঞ্চিতে বসিয়াই কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। পঞ্চাননের দাবী-দাওয়া কিছুই ছিল না। চাহিয়াছিল মাত্র নগদ একশোটি টাকা আর একটি ডাগর-ডোগর মেয়ে।

গোপন সে কিছুই করে নাই। বলিয়াছিল, 'বামুনের ছেলে, লেখাপড়া শিখিনি, কি আর করবো, ষ্টেশনে একটি দোকান করেছি। চা আর তেলেভাজার দোকান। খরচ-

খরচা বাদ রোজগার হয় কোনোদিন দু-টাকা, কোনোদিন তিন টাকা।

এর চেয়ে ভাল পাত্র রাখাল আর পাইবে কোথায়? নগদ একশোটি টাকা মাত্র বরপণ।

পঞ্চানন বলিয়াছিল, 'এই একশো টাকাও আমি চাইতাম না, কিন্তু দোকানের জন্যে কিছু আসবাবপত্র কিনতে হবে। দুটি বেঞ্চি চাই আর চাই ভাল একটি কড়াই আর একটি কেট্‌লি।'

রাখাল বলিয়াছিল, 'দেবো একশো টাকা।'

পঞ্চানন ভাবিয়াছিল, রাখাল হয়তো তাহাদের গ্রামে গিয়া তাহার বাড়ী দেখিতে চাহিবে। অথচ গ্রামে তাহার হিতৈষীর অভাব নাই। কত রকমের কত কথা তাহাকে বলিয়া রাখালের মন খারাপ করিয়া দিতে পারে। তাই সে সেখান হইতে আঙুল বাড়াইয়া তাহাদের আদমপুর গ্রামটি দেখাইয়া দিয়া বলিয়াছিল, 'ওই যে দেখছেন, জোড়া-তালগাছ, ওর উত্তরদিকে ওই যে টিনের বাড়ীটা দেখা যাচ্ছে, ওরই গা ঘেঁসে প্রায় একবিঘে জায়গার ওপর আমার বাড়ী। মাটির বাড়ী অবশ্য··· পাকা দালান নয়।'

রাখাল বলিয়াছিল, 'তাতে কি হয়েছে। আমারও বাড়ী মাটির তৈরি।'

পঞ্চানন বলিয়াছিল, 'আমার আবার গাছপালার শখ একটু আছে। বিস্তর কলাগাছ, পেঁপেগাছ, তরিতরকারি বারো-

মাসের মধ্যে কখনও কিনে খেতে হয় না। আমার বাড়ীর পেঁপে-কলা তো মাষ্টারমশাই খেয়েছেন। ...কি বলেন মাষ্টারমশাই?'

ষ্টেশন-মাষ্টার শুধু পেঁপে কথাটা ছাড়া আর কিছু শুনিতেও পান নাই, বুঝিতেও পারেন নাই। বলিয়াছিলেন, 'আর বলেন কেন মশাই, বাঁদরের জ্বালায় কিছু হবার জো নেই। পেঁপে-গাছ দুটো লাগিয়েছিলাম। হলো না। একটা মুখপোড়া বাঁদর এসে দিলে একেবারে নির্মূল করে'।'

—'না না, আমি আমার বাড়ীর পেঁপের কথা বলছি। আপনি তো খেয়েছেন।'

মাষ্টারমশাই বলিয়াছিলেন, 'হ্যাঁ, খেয়েছি। এই-টুকুটুকু ছোট ছোট, আর তেমন মিষ্টিও নয়। এখানকার মাটিটাই খারাপ।'

পঞ্চানন অপ্রতিভ হইয়া গিয়া চুপ করিয়াছিল। লোকটা এরকম জবাব দিবে জানিলে পেঁপের কথাই সে তুলিত না।

বলিতে সে বাধ্য হইয়াছিল—'বাড়ীর দিকে যাবেন নাকি একটিবার? যাবেন তো চলুন, নিজের চোখেই দেখে আসবেন সব। তবে লোকজন কেউ নেই, ফাঁকা বাড়ী।'

রাখাল বলিয়াছিল, 'না, থাক্। সে খবর আমি নিয়েছি।'

পঞ্চানন ভাবিয়াছিল, পেঁপের কথাতেই বিয়েটা বোধহয় ভাঙিয়া গেল। কিন্তু রাখালই শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে বাঁচাইয়া দিল, বলিল, 'আর আমার কিছু বলবার নেই। এবার একটি দিন ঠিক করে' আমি জানিয়ে দেবো। মেয়ে যদি

দেখতে চাও তো কবে যাবে বলো। বোনটি আমার খুব সুন্দরী।'

—'না, দেখতে যাবার সময়ও নেই, লোকও নেই। আপনি দিন ঠিক করুন গিয়ে।'

কথা এই পর্য্যন্তই। পরের ট্রেণেই রাখাল বাড়ী ফিরিয়াছিল।

পঞ্চানন ভাবিয়াছিল, নিজেদের মেয়েকে সুন্দরী সবাই বলে। হবে হয়তো আর-দশটা বাঙালীর মেয়ে যেমন হয় তেম্‌নি। কিন্তু সুকুমারীকে দেখিয়া পঞ্চাননের মাথাটি ঘুরিয়া গেল।

স্ত্রী যে তাহার এত সুন্দরী হইবে তাহা সে কল্পনাও করে নাই।

আদমপুর ষ্টেশনে যখন সে ট্রেণ হইতে নামিল, শীতের সূর্য্য তখন পশ্চিম আকাশে ঢলিয়া পড়িয়াছে। টিকিট লইতে গিয়া ষ্টেশন-মাষ্টারের নজর পড়িল পঞ্চাননের বৌএর উপর। রঙীন একখানি শাড়ীর ওপর নীল রঙের র‍্যাপার জড়াইয়া সুকুমারী নতমুখে দাঁড়াইয়াছিল। পঞ্চানন বলিল, 'মাষ্টার-মশাইকে প্রণাম করো।'

মাথা হেঁট করিয়া পায়ে হাত দিয়া সুকুমারী প্রণাম করিল। মাষ্টারমশাইএর দেখা যেন আর শেষই হয় না।

—'বাঃ, বেশ বৌ হয়েছে পঞ্চাননের। খুব সুন্দরী বৌ।

চল্ আমার কোয়াটারে চল্, একটু মিষ্টিমুখ করে' যেতে হয়।'

কিন্তু শীতের সন্ধ্যা নামিতে বেশি দেরি হয় না। বাড়ী গিয়া রাত্রের রান্নার ব্যবস্থা করিতে হইবে। লণ্ঠনে তেল আছে কিনা কে জানে। ষ্টেশন-মাষ্টারের কোয়াটারে গেলে দেরি হইয়া যাইবে। পঞ্চানন বলিল, 'আজ থাক্ মাষ্টারমশাই, জানেনই তো—বাড়ী গিয়ে…'

মাষ্টারমশাই বলিলেন, 'আর একদিন আসিস্ তাহ'লে।'

—'আসবো।' বলিয়া পঞ্চানন একটি রিক্সায় চড়িয়া বসিল। সুকুমারী বসিল তাহার পাশে। ষ্টীলের বাক্স দুইটি মাথায় করিয়া আনিয়াছিল একজন খালাসী। তাহাদের পায়ের কাছে বাক্স দুটি সে নামাইতে চাহিল, পঞ্চানন নিষেধ করিল। বলিল, 'ও দুটো এখানে দিস্‌নে বাবা, বসতে কষ্ট হবে। এই তো কাছেই বাড়ী। একটু কষ্ট করে' দিয়ে আয় বাবা আমার বাড়ীতে ফেলে।'

গ্রাম হইতে গিয়াছিল পাঁচজন বরযাত্রী, একজন পুরোহিত, একজন নাপিত আর গিয়াছিল টোটা। সকালের ট্রেণে তাহাদের পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। চাবির গোছাটা টোটার হাতে দিয়া পঞ্চানন বলিয়া দিয়াছে, 'ঘর-দোর পরিষ্কার করে' রাখিস্। আমরা ঠিক চারটে চল্লিশে গিয়ে পৌঁছোবো।'

ট্রেণ ঠিক চারটে চল্লিশেই আসিয়াছে।—টোটা সব ঠিক করিয়া রাখে তবে তো……

আজ শুভদিন

পঞ্চানন সুকুমারীর মুখের দিকে তাকাইল। পড়ন্ত-রৌদ্রের আভায় মুখখানি যেন আরও সুন্দর দেখাইতেছে। কপালের উপর কয়েকগাছি চুল আসিয়া পড়িয়াছে। মাঝখানে গোল একটি সিঁদুরের টিপ।

পঞ্চানন বলিল, 'মুখে রোদ্দুর লাগছে। রিক্সার পর্দ্দাটা ফেলে দেবো ?'

সুকুমারী বলিল, 'না। বেশ দেখতে দেখতে যাচ্ছি।'

—'এই আমাদের গ্রাম। বাড়ীর জন্যে তোমার মন কেমন করছে ?'

সুকুমারী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না।'

—'তোমার খুব কষ্ট হবে কিন্তু।'

সুকুমারী আবার বলিল, 'না।'

বলিয়াই সে তাহার চোখমুখের ইসারায় যে-লোকটি রিক্সা চালাইতেছিল, তাহাকে দেখাইয়া দিল।

পঞ্চানন বলিল, 'ও আমাদের গাঁয়েরই ছেলে, ওর সাম্‌নে লজ্জা কিসের! ···শুনছিস্‌ মাণিক, আমার বৌ তোর সামনে কথা কইতে লজ্জা করছে।'

মাণিক একগাল হাসিয়া চট্‌ করিয়া একবার পিছন ফিরিয়া বলিল, 'পঞ্চু-খুড়োর বৌ তুমি যে আমাদের খুড়ীমা হলে' গো।'

সুকুমারী ঈষৎ হাসিয়া মাথার ঘোমটাটা একটু টানিয়া লইল।

আজ শুভদিন

গাড়ী আসিয়া থামিল পঞ্চাননের বাড়ীর সুমুখে।

পঞ্চানন টোটার হাতে চাবি দিয়া বলিয়াছিল, সে যেন তালা খুলিয়া ঘরে ঢুকিয়া ঘর-দোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখে।

অথচ রিক্সা হইতে নামিয়াই দেখে, পাড়ার অনেক-গুলা মেয়ে তাহার বাড়ীর সুমুখে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েগুলা ছুটিয়া আসিতেছে বৌ দেখিবার জন্য।

সদর দরজা খোলা। হঠাৎ বাড়ীর ভিতর উলুর শব্দ উঠিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার তিন-চারজন মেয়ে বাহির হইয়া আসিল। কাহারও হাতে জলের ঝারি, কাহারও হাতে শাঁখ।

শাঁখ বাজাইয়া, উলু দিয়া তাহারা বধূবরণ করিয়া সুকুমারীকে একরকম ধরিয়া ধরিয়া বাড়ীর ভিতর লইয়া গেল।

পঞ্চানন ভাবিয়াছিল, বাড়ী গিয়াই নববধূকে হয়তো উনান ধরাইয়া রান্না করিতে হইবে। কিন্তু টোটা বাহাদুর ছেলে, সে তাহার মাকে ডাকিয়া আনিয়াছে। জেলেপাড়া হইতে মাছ আনিয়াছে, তরিতরকারি যাবতীয় যাহা প্রয়োজন সব-কিছু সংগ্রহ করিয়া রীতিমত ভোজের আয়োজন করিয়া ফেলিয়াছে।

মেয়েরা হাসিতে হাসিতে নূতন বৌকে ঘরের ভিতর লইয়া

গিয়া বসাইল। গাঁটছড়া-বাঁধা পঞ্চাননের নিস্তার নাই, তাহাকেও সঙ্গে সঙ্গে যাইতে হইল।

পাড়ার মেয়ে রাধা, সুমতি, মায়া, চন্দনা—এই সেদিন দেখিয়াছে নিতান্ত ছেলেমানুষ ছিল, ফ্রক পরিয়া চোখের সুমুখে ঘুরিয়া বেড়াইত, হঠাৎ তাহারা কখন্ যে এত বড় হইয়াছে কে জানে। কাহারও-বা কপালে সিঁদুর, বিবাহ হইয়া গিয়াছে ; আবার কেহ-বা এখনও অবিবাহিতা।

যাওয়া-আসার মুখে দৈবাৎ কাহারও সঙ্গে হয়তো-বা মুখোমুখি দেখা হইয়াছে। লজ্জায় মুখ নামাইয়া কেহ-বা চলিয়া গিয়াছে, নিতান্ত চোখোচোখি হইয়া গেলে কেহ-বা শুধাইয়াছে, 'কেমন আছো পাঁচুদা ?' পঞ্চানন বলিয়াছে, 'ভাল আছি।'

এই তো ছিল ইহাদের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক।

আজ তাহারাই তাহার নিতান্ত আপন-জন হইয়া উঠিয়াছে। শূন্য-গৃহ আজ তাহার পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে আত্মীয়-পরিজনে। কে বলিল তাহার কেহ নাই ? গর্ব্বে আনন্দে পঞ্চাননের বুকখানা ভরিয়া গেল। কোথায় যে তাহাদের বসাইবে, কি বলিয়া অভ্যর্থনা করিবে ভাবিয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। তাহার কি এসময় এম্‌নি বর সাজিয়া কনের কাছটিতে বসিয়া থাকা চলে ?…

—'টোটা কোথায় ?' বলিয়া সে তাহার গাঁটছড়া-বাঁধা চাদরটা ফেলিয়া দিয়া সেখান হইতে চলিয়া যাইবার উদ্যোগ

করিতেই চন্দনা বলিয়া উঠিল, 'কোথায় যাচ্ছো পাঁচুদা? এসময় বৌকে ছেড়ে তোমাকে যেতে নেই।'

পঞ্চানন বলিল, 'যেতে নেই কি রে? তোরা সব এসেছিস্ আমার বাড়ীতে…খাবার-দাবার কি ব্যবস্থা হলো দেখি গিয়ে। তোরা সব খেয়ে যাবি ভাই, আমার লোকজন নেই, জানিস্ তো সব, আমি একা মানুষ। টোটা কোথায় গেল—টোটা। টোটা।'

বলিতে বলিতে পঞ্চানন সত্যই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল টোটার সন্ধানে।

টোটার সন্ধানে, না চোখের জল গোপন করিতে—তাই বা কে জানে।

আনন্দে আত্মহারা পঞ্চানন চোখ মুছিতে মুছিতে রান্না-ঘরের দিকে যাইতেছিল, দু-কাপ চা হাতে লইয়া টোটা তাহার সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'চলে এলে? আমি তো নিয়ে যাচ্ছিলাম।'

পঞ্চানন জিজ্ঞাসা করিল, 'কি?'

টোটা বলিল, 'তোমাদের চা। নতুন বৌদির আর তোমার।'

—'আমাদের না দিলেও চলবে, যারা এসেছে তাদের আগে দে।'

'কারা এলো আবার?' টোটা যেন আকাশ হইতে পড়িল।

পঞ্চানন বলিল, 'দেখতে পাচ্ছিস্ না? চন্দনা, রাধা, সুমতি—'

টোটা বলিল, 'ওরা চা খেতে আসেনি দাদা…নাও ধরো।'

বলিয়া চায়ের কাপটা তাহার হাতে ধরাইয়া দিয়া বলিল, 'ওরা এসেছে, বৌ দেখতে। ভেবেছিল, খ্যাঁদা-প্যাঁচা যাহোক একটা কিছু হবে, কিন্তু বৌ দেখে মুণ্ডুটি ওদের ঘুরে গেছে।'

উনানে কি যেন চড়াইয়া দিয়া টোটার মা তরকারি কুটিতে বসিয়াছিল। বলিল, 'তোর বৌ কিন্তু আমি এখনো দেখিনি পঞ্চু, টোটা তো ওখান থেকে এসে অবধি জনে-জনে ডেকে ডেকে বলে' বলে' বেড়াচ্ছে। ওই ছুঁড়িগুলো এলো তো শুধু ওরই কথা শুনে।'

টোটা বলিল, 'মিছে না সত্যি—যাও না, দেখেই এসো না! চোখ তো রয়েছে।'

পঞ্চানন বলিল, 'খুড়িমাকে যেতে হবে না। টোটা, যা ওকে এইখানে ডেকে আন্। বল্—খুড়িমাকে প্রণাম করবে এসো।'

খুড়িমা বলিল, 'নতুন বৌকে আর রান্নাঘরে আসতে হবে না বাবা, আমিই যাচ্ছি।'

পঞ্চাননের মুখে ম্লান একটুখানি হাসি দেখা গেল। বলিল, 'তুমি সাত-তাড়াতাড়ি এসে রান্না চড়িয়েছো তাই, নইলে ওকেই তো এতক্ষণ হাঁড়ি ধরতে হতো, খুড়িমা।'

—'না বাবা, এ ক'টা দিন আর ওকে কিছু করতে দিস্‌নি। আমিই চালিয়ে দেবো।'

—'এ ক-টা দিন মানে?'

টোটার মা বলিল, 'অষ্টমঙ্গলা করতে বৌ যাবে না বাপের বাড়ী? জোড়ে গিয়ে দ্বিরাগমন করতে হয়।'

পঞ্চানন বলিল, 'না খুড়িমা, আমাদের ও-সব কিছু হবে-টবে না। আমার একা ঘর, নিজে রান্না করে' খাই, আজ গিয়েই ওকে রান্না করতে হবে—এইসব কথা আমি ব'লে-কয়েই নিয়ে এসেছি ওকে।—ওই তো আসছে।'

দেখা গেল, টোটা ততক্ষণে তাহার কাজ সারিয়া ফেলিয়াছে। পঞ্চাননের নির্দ্দেশ সে পালন করিয়াছে। হাসিতে হাসিতে টোটা আসিতেছে সকলের আগে-আগে, আর তাহার পিছনে এক নারীবাহিনী।

সুকুমারী পঞ্চাননের মুখের দিকে চোখ তুলিয়া তাকাইল। তাহার সে চাহনির অর্থ বুঝিতে পঞ্চাননের দেরি হইল না। সেও তাহার চোখের ইসারায় টোটার মাকে দেখাইয়া দিয়া বলিল, 'খুড়িমাকে প্রণাম করো।'

সুকুমারী তৎক্ষণাৎ মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া খুড়িমার পায়ের ধূলা মাথায় লইল।

খুড়িমা আশীর্ব্বাদ করিয়া তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিল। বলিল, 'এ যে চমৎকার বৌ হয়েছে পঞ্চু। বোসো মা বোসো।

এইখানে—এই রান্নাঘরে বসবে, না ও-ঘরে গিয়ে একবারে কাপড়-চোপড় ছেড়ে—'

খুড়িমার কথাটাকে সুকুমারী শেষ করিতে দিল না। দেয়ালের গায়ে ঠেসানো ছিল একটা কাঠের পিঁড়ি। সেই পিঁড়িটাকে পাতিয়া লইয়া তাহার উপর বসিতে বসিতে বলিল, 'না, আমি এইখানেই বসি।'

খুড়িমা হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল।—'ভাল শাড়ীটা ছেড়ে একটা আটপৌরে কাপড় পরে' এসে বসলেই হতো না?'

এই বলিয়া পাড়ার মেয়েগুলার দিকে তাকাইয়া খুড়িমা বলিল, 'বৌ দেখা তো তোদের হয়ে গেছে মা, আবার কেন এখনও ভিড় করে' দাঁড়িয়ে আছিস্? যা সব—বাড়ী যা।'

কথাটা পঞ্চাননের বুকে গিয়া ধক্ করিয়া বাজিল। বলিল, 'থাক্ না খুড়িমা। ওরা তো রোজ আসে না। এসেছে আমার বৌ দেখতে—কত আমার ভাগ্যি—'

খুড়িমা সোজা সত্য কথা সোজা করিয়াই বলে। এই দিক দিয়া গ্রামে তাহার খ্যাতি আছে। খুড়িমা তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, 'থাম্ বাছা, ভাগ্যি-ভাগ্যি করিস্‌নি। ও ছুঁড়িদের কাউকে আমার জানতে বাকি নেই। এই যে এত সুন্দরী বৌ ওরা দেখে যাচ্ছে, ওরা কি খুশী হয়েছে নাকি? কখ্‌খনো না। জ্বলেপুড়ে মরে যাচ্ছে। এক্ষুনি তোর বাড়ী থেকে বেরিয়েই বলতে আরম্ভ করবে···সুন্দরী নয়, সুন্দরী নয়, ওকে সুন্দরী বলে না—গায়ের রংটা শুধু সাদা। আবার

কেউ কেউ বলবে, সাদা রং তো নয়…ওকে ধবলকুষ্ঠ বলে। প্রাণ খুলে প্রশংসা করতে কেউ জানে না। ভালকে ভাল বলতে পারে না।'

কথাটা শুনিয়া সুমতি বলিল, 'তুমি পিসি ভারি ঠোঁট-কাটা। তাড়িয়ে দিচ্ছো যখন, চলে' না-হয় আমরা যাচ্ছি। …আয় লো আয়!'

এই বলিয়া সকলের আগেই সে দরজার দিকে পা বাড়াইল।

ইহার পর আর কাহারও থাকা চলে না। কিন্তু যাইবার সময় কথাটার পাল্‌টা জবাব না দিয়াই-বা যায় কেমন করিয়া?

একজন বলিল, 'বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়ো।'

আর-একজন বলিল, 'যার বাড়ী সে কিছু বলছে না, ওঁর যেন নাড়ী টনটন্ করে' উঠছে।'

এমনি সব মন্তব্য প্রকাশ করিতে করিতে সকলেই চলিয়া গেল।

পঞ্চানন কিছুই বলিতে পারিল না। অপরাধীর মত উঠানের একপাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

খুড়িমা কিন্তু নির্বিকার। সবাই চলিয়া গেলে, ডাকিল, 'টোটা!'

টোটা দূরে দাঁড়াইয়া মাটির দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া কি যেন দেখিতেছিল। তাহার মা তাহাকে দেখিতে পাইল। বলিল, 'ওখানে ওরকম করে' কি দেখছিস্?'

টোটা বলিল, 'ফুলগাছের বীজ পুঁতেছি। গাছ বেরুলো কিনা দেখছি।'

—'ফুল কি হবে রে? বৌদিদিকে পূজো করবি নাকি?'

টোটা বলিল, 'ধেৎ! পূজো কেন করবো! মালা গেঁথে দেবো বৌদিদিকে।'

কথাটা শুনিয়া সুকুমারী হাসিল।

টোটার মা বলিল, 'শোনো বৌমা, তোমার দেওরটির কথা শোনো। তা—মালা যখন দিবি তখন দিবি, আপাততঃ সদর দোরটা বন্ধ করে' দিয়ে আয়।'

টোটা সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া নূতন বৌদিদির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'মা বেশ ক্যাট্‌ক্যাট্‌ করে' কথা বলতে পারে। মেয়েগুলোকে দিলে কেমন তাড়িয়ে। ভালই হলো—না কি বলো বৌদি? বাড়ীটা কেমন ফাঁকা হয়ে গেল।'

সুকুমারী এতক্ষণ চুপ করিয়াই ছিল, কথা বলিবার লোক পায় নাই। এইবার টোটাকে কাছে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার দোকান কবে খুলবে?'

টোটা বলিল, 'দাদা যেদিন বলবে, যখন বলবে।'

সুকুমারী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'বৌদিদি যদি বলে, কাল দোকান খুলতে হবে, তাহ'লে খুলবে না?'

টোটা বলিল, 'নিশ্চয় খুলবো।'

সুকুমারী বলিল, 'তাহ'লে আমি বলছি—কাল খুলতে হবে।'

কথাটা পঞ্চানন শুনিল, বলিল, 'কাল খুলবে? আমি

বলছি কি—কাল বৌভাত হোক্। জনকতক লোকজন খাইয়ে —বিয়ের ঝঞ্ঝাটটা চুকিয়ে দিই। তারপর দোকান খুলবো। না কি বলো খুড়ী?'

খুড়ী বলিল, 'হাতে টাকা আছে বুঝি?'

পঞ্চানন খুড়ীর কাছে আসিয়া রান্নাঘরের খুঁটি ঠেস্ দিয়া বসিল।

খুড়ী বলিল, 'বৌভাতের জন্যে টাকা বুঝি দিয়েছে বৌমার দাদা?'

পঞ্চানন বলিল, 'না খুড়ী, টাকা দেবার মতন অবস্থা ওদের নয়।'

খুড়ী বলিল, 'তাহ'লে আর বৌভাত কেন?'

পঞ্চানন বলিল, 'বুড়ো বয়েসে বিয়ে করলাম, বৌভাত না করলে লোকে কথা শোনাবে খুড়ী।'

খুড়ী কিন্তু অন্য কথা বলিল, 'তা—দেখবার মতন বৌ যখন হয়েছে তখন দেখুক সবাই। মন্দ কি? কিন্তু বৌভাতে খরচ অনেক হবে মনে থাকে যেন।'

—'কত হবে?'

খুড়ী বলিল, 'গাঁটি তো আমাদের ছোট নয়। তার ওপর ছেলেদের বলতে হলে' মেয়েদেরও বলতে হবে।'

পঞ্চানন চমকিয়া উঠিল। বলিল, 'সমস্ত গ্রামের মেয়ে-ছেলে সবাইকে বলতে হবে? না খুড়ীমা, আমি বলছি কি, বেছে বেছে দশ-বারো জন লোককে খাইয়ে দেবো।'

খুড়ী বলিল, 'আমার কথা নিস্ যদি তো বলি।'

পঞ্চানন বলিল, 'কেন নেবো না? বলো।'

খুড়ী বলিল, 'ছাখ্, তোর অবস্থা ভাল নয়। তুই যদি খুব ঘটা করে' বৌভাত না করিস্ তাহ'লেও কেউ কিছু বলবে না। দশজন বললেই কুড়িজন হবে। তারও খরচ কম নয়। তার চেয়ে বৌভাত এখন থাক্।'

পঞ্চানন বলিল, 'না খুড়ী, ষ্টেশন-মাষ্টার, কিষণলাল, বিহারী, নাটুয়া—এদের সঙ্গে আমার দু-বেলা দেখা হবে, এদের না বললেই চলবে না। তাই ভেবেছি, এদের যখন বলবো তখন সেইসঙ্গে গ্রামের দু-চারজনকে বলে' একসঙ্গেই সেরে দেবো হাঙ্গামাটা। এইসময় দু-দশটা টাকাও হাতে রয়েছে, নইলে সব যাবে খরচ হয়ে।'

ইহার উপর আর কথা চলে না।

সুকুমারীর মুখের দিকে তাকাইয়া খুড়ী বলিল, 'তাহ'লে কোমর বাঁধো বৌমা।'

পঞ্চাননও সুকুমারীর দিকে তাকাইল। বলিল, 'কোমর বেঁধেই ও এসেছে খুড়ী। বড় ভাল মেয়ে। সেদিক দিয়ে আমার ভাগ্য ভাল।'

স্বামীর মুখে এইরকম প্রশংসা শুনিয়া আনন্দে সুকুমারীর চোখ দুইটা জলে ভরিয়া আসিল।

এখানে বিবাহের কথা সুকুমারী যখন শুনিয়াছিল তখন সে তাহার ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়াছিল। ভাবিয়াছিল, দাদা-

বৌদি তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি চায়, তাই কোনোরকমে এমন একটা লোকের সঙ্গে তাহার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিয়াছে, যাহার গৃহে অন্নের সংস্থান নাই। আত্মীয়স্বজনহীন নির্ব্বান্ধব কোন্ এক অশিক্ষিত গ্রাম্য বর্ব্বর হইবে তাহার স্বামী। পিতৃপুরুষের যে ভিটাতে সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে সেখান হইতে তাহার চিরনির্ব্বাসন।

এখন তাহার মনে হইতেছে, হোক্ তাহার চিরনির্ব্বাসন! হোক্ তাহার স্বামী দরিদ্র, হোক্ সে অশিক্ষিত, না থাক্ তাহার সম্পদ, না থাক্ আত্মীয়স্বজন! তাহার যাহা আছে, এমনটি আর কাহারও নাই।

নারীজীবনের একমাত্র যাহা কাম্য, যাহা না পাইলে অনন্ত ঐশ্চর্য্যও তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়, সে তাহাই পাইয়াছে।

সে পাইয়াছে স্বামীর ভালবাসা।

বৌভাত করিতে আপত্তি জানাইয়াছিল টোটার মা।

সুকুমারী কিন্তু সেইদিনই রাত্রে পঞ্চাননকে বলিল, 'না, তুমি বৌভাত করো। রান্নাবান্না কাজকর্ম্ম আমি করবো।'

বিয়ের কনে-বৌ বলে কি?

পঞ্চানন বলিল, 'পারবে তুমি?'

সুকুমারী হাসিল। হাসিয়া বলিল, 'কেন পারবো না? ছাখো না পারি কি না!'

পঞ্চানন তাহার মুখের পানে বিমুগ্ধদৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল।

—'কি দেখছো অমন করে' ?'

—'দেখছি ?'

—'হ্যাঁ।'

—'দেখছি তোমাকে।'

—'আমাকে দেখবার কি আছে ?'

পঞ্চানন জিজ্ঞাসা করিল, 'কিছু নেই ?'

সুকুমারী বলিল, 'না।'

পঞ্চানন বলিল, 'নিজের চেহারা তো দেখতে পাচ্ছি না। না পাইগে, জানি তো, নিজে কেমন। তোমার পাশে আমাকে মানায় না। সত্যি বলছি।'

সুকুমারী পঞ্চাননের কোলের উপর মাথা রাখিয়া বলিল, 'ওরকম করে' বোলো না, আমার লজ্জা করে।'

পঞ্চানন তাহাকে আদর করিল। বলিল, 'আমি যা চেয়েছিলাম, তার চেয়ে অনেক বেশি পেয়েছি। এত সুখ আমার অদৃষ্টে সইলে হয়।'

সুকুমারীর চোখ দুইটা জলে ছল্‌ছল্‌ করিতে লাগিল।

পঞ্চানন জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কাঁদছো ?'

বলিয়া তাহারই শাড়ীর আঁচল দিয়া তাহার চোখ মুছাইয়া দিতে গেল। সুকুমারী তাহার হাতটা সরাইয়া দিয়া বলিল, 'কাঁদিনি। আনন্দে আমার চোখে জল আসছে। আমি কিন্তু, সত্যি বলছি, তোমাকে ছেড়ে একটি দিনও থাকতে পারবো না।'

—'আমিই কি থাকতে পারবো নাকি ?'—পঞ্চানন বলিল, 'তোমাকে ছাড়ছে কে ? আমি তোমাকে আর তোমার দাদার বাড়ী যেতে দেবো না।'

সুকুমারী বলিল, 'যাচ্ছে কে ?'

এমনি করিয়া কত রাত্রি পর্য্যন্ত যে তাহারা কথা বলিল তাহার কোনও ঠিক-ঠিকানা রহিল না। শেষে সুকুমারীই বলিল, 'সকাল হয়ে গেল বোধহয়। একটু ঘুমিয়ে নাও।'

পঞ্চানন বলিল, 'তুমি ঘুমিয়ে নাও। কাল সকালেই তোমাকে রান্না করতে হবে।'

সুকুমারী বলিল, 'আমার এতটুকু কষ্ট হবে না, তুমি দেখে নিও।'

কষ্ট সত্যই হইল না। সকালে উঠিয়া স্নান করিয়া সুকুমারী রান্নাঘরে গেল। পঞ্চানন গেল নিমন্ত্রণ করিতে।

টোটা রহিল তাহার বৌদিদির কাছে।

নিমন্ত্রণ করিয়া ফিরিয়া আসিতে পঞ্চাননের একটু দেরি হইয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, টোটা ও তাহার বৌদিদি বসিয়া বসিয়া গল্প করিতেছে।

পঞ্চানন ভাবিল, রান্না বোধহয় এখনও আরম্ভ করে নাই। বলিল, 'এখনও রান্না চড়াওনি ? দেরি হয়ে যাবে যে। ষ্টেশন-মাষ্টার বললেন, ন-টার গাড়ীটা পাস করিয়ে

দিয়েই যাচ্ছি, তাড়াতাড়ি খাইয়ে দিও—আমাকে আবার বারোটার গাড়ী আসবার আগেই ষ্টেশনে পৌঁছোতে হবে।'

সুকুমারী বলিল, 'তা বেশ তো। কোথায় তোমার ইষ্টিশান-মাষ্টার? এলেই বসিয়ে দিও। আমি খাইয়ে দেবো।'

পঞ্চানন ফিরিয়া দাঁড়াইল।—'তার মানে?'

টোটা একবার সুকুমারীর মুখের পানে তাকাইল। সুকুমারী চোখ টিপিল। কিন্তু তাহা সে দেখিতে পায় নাই এমনি ভান করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিয়া বসিল, 'হয়ে গেছে।'

পঞ্চানন জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হয়ে গেছে?'

টোটা বলিল, 'রান্না হয়ে গেছে। আসুক্ না তোমার লোকজন, এক্ষুনি খাইয়ে দিতে পারি। ওই হ্যাখো না, উনুনে শুধু চাট্‌নি চড়ে' রয়েছে। আর সব শেষ।'

এই বলিয়া টোটা হি-হি করিয়া হাসিতে লাগিল।

পঞ্চানন বলিল, 'কি করে' হলো? আমি তো অবাক্ হয়ে যাচ্ছি।'

সুকুমারী বলিল, 'হুটো বড় বড় উনুনে রান্না হচ্ছে, তাড়াতাড়ি হবে না কেন?'

সুকুমারীর দিকে পঞ্চানন তাকাইয়া রহিল বিমুগ্ধদৃষ্টিতে।

তাকাইবার কথাই।

সুন্দর গায়ের রং—সুন্দর সুগঠিত দেহ, পরনের শাড়ী-খানা আঁটসাঁট্ করিয়া কোমরে জড়াইয়া পরিয়াছে।

শীতকালেও কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়াছে, তাহার উপর অবিন্যস্ত দু-একগাছি চুল আসিয়া পড়িয়াছে।

সুকুমারী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'এমন করে' তাকিয়ে কি দেখছো ?'

পঞ্চানন বলিল, 'তোমাকে।'

—'যাঃ-ও !'—সুকুমারী সেখান হইতে সরিয়া গিয়া টোটার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

টোটা বলিল, 'এবার লোকজন ডেকে আনি, না কি বলো বৌদি ?'

সুকুমারী বলিল, 'তোমার দাদাকে জিজ্ঞাসা করো। সে যদি বলে ডাকতে তো ডাকো।'

পঞ্চানন ছিল কাছেই দাঁড়াইয়া। ইহাদের প্রতিটি কথাই সে শুনিতে পাইল। বলিল, 'বা-রে ! আমি যে এখনও স্নান করিনি !'

এবার সুকুমারী তাহার দিকে মুখ ফিরাইল। বলিল, 'তা যাও স্নান করোগে। এখনও দাঁড়িয়ে কেন ?'

পঞ্চানন বলিল, 'ঠিক বলেছো, স্নানটা করে' আসি। টোটা ততক্ষণ জায়গাটা পরিষ্কার করে' রাখ্।'

বৌভাত চুকিয়া গেল।

বৌ দেখিয়া সবাই প্রশংসা করিতে লাগিল। পঞ্চাননের যে অমন বৌ হইবে কেহ তাহা জানিতে পারে নাই।

আজ শুভদিনে

ষ্টেশন-মাষ্টার বৌভাতের নিমন্ত্রণ খাইতে আসিলেন সুকুমারীর জন্য একখানি শাড়ী হাতে লইয়া। কিষণলাল আসিল পঞ্চাশটি টাকা লইয়া। এমনি করিয়া সুকুমারীর কিছু পাওনা হইল।

বৌভাতের পরের দিন আবার সেই আগের মতই ফাঁকা বাড়ী ফাঁকা হইয়া গেল।

আবার পঞ্চাননের দোকান খুলিল।

সুকুমারী বলিল, 'তোমরা তো তেলেভাজা বিক্রি করো। আমি একটা জিনিস তৈরী করে' দেবো। কাল থেকে সেই জিনিস বিক্রি করবে।'

টোটা জিজ্ঞাসা করিল, 'কি জিনিস, বৌদি ?'

সুকুমারী বলিল, 'কাল দেখবে।'

বাড়ীতে অনেকগুলা কাঁচকলার কাঁদি ফলিয়াছিল। সুকুমারী কয়েকটা কাঁচকলা সংগ্রহ করিল। ছোট ছোট কিছু চিংড়ী-মাছ আনাইল। তাহার পর চিংড়িমাছ বাটিয়া, কাঁচকলা সিদ্ধ করিয়া, আদা বাটিয়া, লঙ্কা বাটিয়া সব একসঙ্গে মাখাইয়া চপ তৈরি করিল। বিস্কুট এখানে পাওয়া যায় না, তাই বিস্কুটের বদলে মুড়ি গুঁড়া করিল, পোস্ত আনাইল, ডিম আনাইল এবং দু-রকমের চপ ভাজিয়া টোটাকে বলিল, 'বোসো দেখি ঠাকুরপো ; আগে এই পুঁচ্‌কে ব্রাহ্মণকে ভোজন করিয়ে দেখি কিছু পুণ্যি হয় কি না।'

চপ খাইয়া টোটা বলিল, 'খাসা। এরকম জিনিস এখানে

পাওয়া যায় না বৌদি। এক-একটা চপ আমরা দু-আনা দামে বিক্রি করবো।'

সুকুমারী বলিল, 'না। দু-আনা দাম কখ্খনো বোলো না। ডিম দিয়ে যে চপ ভাজবে তার দাম নেবে চার পয়সা। আর ডিম ছাড়া যে চপ ভাজবে তার দাম হবে দু-পয়সা।'

পরের দিন পঞ্চাননের দোকানে সুকুমারীর তৈরী চপ বিক্রি হইতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে এই কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল। যে একবার খাইল সে আবার আসিল। ট্রেণের যাত্রীরা খাইতে লাগিল। গ্রামের লোক চপ কিনিবার জন্য ষ্টেশনে আসিয়া ভিড় জমাইল।

পঞ্চানন দোকানে বসিয়া বসিয়া চপ ভাজে। টোটা বিক্রি করে। আবার একসময় টোটা ভাজে, পঞ্চানন বিক্রি করে।

ট্রেণ আসিলে টোটাকে প্লাটফর্ম্মে ছুটিতে হয়।

রোজ রোজ বিক্রি বাড়িতে থাকে।

হাসি-হাসি মুখে টোটা ছুটিয়া যায় গ্রামে। সুকুমারীর কাছে গিয়া বলে, 'বৌদি, আরও একশো চপ চাই।'

সুকুমারী প্রস্তুত হইয়া থাকে। আবার চপ তৈরি হয়।

দিনকতক পরে টোটা এক অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া বসে।

প্লাটফর্মে গিয়া চপের একটা নামকরণ করিয়া চীৎকার করিতে থাকে, 'বৌদি-চপ চার পয়সা। সাদা-চপ দু-পয়সা।'

'সাদা'টাকে লোকে ভুল করিয়া বৌদিদির সঙ্গে মিলাইয়া 'দাদা' করিয়া লয়।

শেষে চপের নাম হইয়া যায়—দাদা-চপ আর বৌদি-চপ।

আদমপুর ষ্টেশন চপের জন্য বিখ্যাত হইয়া ওঠে।

পঞ্চাননের মুখে হাসি ফোটে।

রাত্রে টাকা-পয়সার হিসাব করিতে বসিয়া পঞ্চানন বলে, 'এ সবই হলো আমার স্ত্রীর জন্যে। কথায় আছে—স্ত্রীভাগ্যে ধন। আমারও হলো তাই।'

টোটার বেতন ছিল রোজ দু-আনা। সে-জায়গায় এখন সে মাসিক পনেরো টাকা পায়। আর একটা লোক রাখিতে হইয়াছে। টোটা একা সামলাইতে পারে না।

মানুষের সুদিন যখন আসে তখন সব দিক দিয়াই আসে।

সুকুমারী সন্তানসম্ভবা।

একা মানুষ, সংসারে লোকজন নাই। পঞ্চানন বলিল, 'ছেলে হবার সময় তুমি কি বৌদিদির কাছে যাবে?'

সুকুমারী বলিল, 'না।'

বিবাহের সময় সেই যে সুকুমারী আদমপুর আসিয়াছে, একটিবারের জন্য যাইবার নাম পর্য্যন্ত মুখে আনে না।

আর কেনই-বা সেখানে সে যাইবে।

দাদা একখানা চিঠি দিয়াও তাহার সংবাদ লয় নাই। সুকুমারীকে বিদায় করিয়া তাহারা যেন নিশ্চিন্ত হইয়াছে।

সুকুমারী বলে, 'এখান থেকে গেলে আমার চলবেই-বা কেন? আমার সংসার দেখবে কে?'

রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বে তাহাকে শয্যাত্যাগ করিতে হয়। আগের রাত্রে কাঁচকলা সিদ্ধ করিয়া রাখে। চপ তৈরি করিবার ব্যবস্থা এখন পাকাপাকি হইয়া গিয়াছে। সকালেই জেলেবৌ আসিয়া চিংড়িমাছ দিয়া যায়। টোটা আসে। পঞ্চানন উনান ধরাইয়া দেয়। তাহার পর সকলে মিলিয়া চপ তৈরি করে।

গ্রামের যে লোকটিকে রাখা হইয়াছে, অতি প্রত্যূষে ষ্টেশনে গিয়া তাহাকে দোকান খুলিতে হয়। ধূনা-গঙ্গাজল দিয়া, উনান ধরাইয়া সে গ্রামে আসে চপ লইয়া যাইবার জন্য। গুনিয়া গুনিয়া ডালাভর্ত্তি কাঁচা চপ প্রথম-দফায় লইয়া গিয়া সে উনানে তেল চড়াইয়া কাজ আরম্ভ করে। তাহার পর টোটা যায় আর-এক ডালা চপ লইয়া। সবার শেষে যায় পঞ্চানন।

দুপুরে বারোটার ট্রেণ পার করিয়া একে একে গ্রামে আসিয়া খাইয়া যায়। রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত দোকানের কাজ চলে।

রাত্রি দশটার পর দোকান বন্ধ করিয়া টাকা-পয়সা লইয়া তিনজনে একসঙ্গে গ্রামে ফিরিয়া আসে।

আজ শুভদিন

বিবাহের বৎসর ঘুরিতে না-ঘুরিতে পঞ্চাননের একটি ছেলে হইল।

ছেলের নাম রাখা হইল শঙ্কর।

স্বাস্থ্যবান বাপ আর স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী মা। ছেলেও দেখিতে সুন্দর হইল।

রাজপুত্রের মত ছেলে। পঞ্চানন হাসিতে হাসিতে বলে, 'হতভাগা পথ ভুলে এলো আমার বাড়ীতে। কপালে ওর অনেক দুঃখু আছে।'

সুকুমারী বলে, 'ও কি কথা বলছো? কপালে দুঃখু থাকবে কেন? দেখবে ওই ছেলে আমার রাজা হবে।'

পঞ্চানন ম্লান একটু হাসে। হাসিয়া বলে, 'ভগবান তাই যেন করেন। জয় বাবা বিশ্বনাথ! জয় বাবা শঙ্কর!'

শঙ্কর আদরে-যত্নে মানুষ হইতে থাকে।

দোকান হইতে আজকাল লাভ বেশ ভালই হয়। সুকুমারী টাকা জমায়। বলে, 'এই টাকা আমি জমাচ্ছি কেন বলো দেখি?'

পঞ্চানন বলে, 'জানি গো জানি। আমাদের ধানের জমি নেই। তুমি জমি কিনবে।'

সুকুমারী বলে, 'না। জমি আমি কিনবো না।'

পঞ্চানন একটু অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে তাকায়।

মেয়েটা বলে কি?

মানুষের সবদিন সমান যায় না। তাই অসময়ের জন্য গ্রামের মানুষ ধানের জমি কিনিয়া রাখে। মাথা গুঁজিবার

মত একটুখানি আশ্রয় আর সারা বছরের পেটের ভাতের সংস্থান যদি থাকে তো গ্রামের লোক আর কিছু চিন্তা করে না। ইহার উপর পুকুরে মাছ আর গোয়ালে গাই যদি থাকে তো নিজেকে রাজা-উজির ভাবিয়া পরমানন্দে দিন কাটায়। গ্রাম ছাড়িয়া কোথাও যাইতে চায় না।

সেও এই গ্রামেরই মানুষ।

পিতামহ ছিলেন ব্যবসাদার। তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছিলেন প্রচুর ভূসম্পত্তি। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর দেখা গেল, ব্যবসায়ে লোকসান দিয়া তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। উপরন্তু রাখিয়া গিয়াছেন কিছু ঋণ। তাহার পিতা সারা-জীবন শুধু উপার্জ্জন করিয়া পিতৃঋণ পরিশোধ করিয়াছেন। জমিজমা কিছুই করিতে পারেন নাই।

তাহার পর তাহার মা মরিয়াছে। বাবা মরিয়াছে। পিতার একটিমাত্র সন্তান। তাহার বয়স যখন দশ বৎসর, তখন সে দেখিয়াছে এ পৃথিবীতে সে একা। পিতামাতা আত্মীয়স্বজন কেহ কোথাও নাই। থাকিবার মধ্যে আছে শুধু তাহার মাথা গুঁজিবার মত একটুখানি আশ্রয়। বাল্য-কাল হইতে দু-বেলা দুটি অন্নের সংস্থান নিজেকেই করিতে হইয়াছে। লেখাপড়া শিখিবার অবসর হয় নাই। শিখাইবারও কেহ ছিল না। তাই তাহার চিরদিনের আকাঙ্ক্ষা—যদি কোনোদিন সে উপার্জ্জন করিতে পারে, সর্ব্বপ্রথম অন্নের সংস্থান করিবে। ধানের জমি কিনিবে।

অথচ তাহার স্ত্রী বলিতেছে, জমি সে কিনিবে না।

পঞ্চানন সুকুমারীকে আবার জিজ্ঞাসা করিল, 'টাকা নিয়ে কি করবে তাহ'লে?'

সুকুমারী বলিল, 'শঙ্করকে লেখাপড়া শেখাবো।'

সুকুমারীর সইএর কথা মনে পড়িল। সইকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য মাষ্টার রাখা হইল।...মাষ্টারমশাই বলিলেন, মাসে পাঁচটি করে' টাকা তোমার দাদাকে দিতে বোলো, তাহ'লে তোমাকেও শেখাবো।'

পাঁচটি টাকা তাহার দাদা দেয় নাই। বৌদিদি বাধা দিয়াছিল।

সে দুঃখ তাহার আজও আছে।

তাহার পর বিবাহ। স্বামী হইল এক অশিক্ষিত গ্রাম্য-যুবক।

তাই তাহার ইচ্ছা—ছেলেকে লেখাপড়া শিখাইয়া শিক্ষিত করিয়া তুলিবে।

পঞ্চানন বলিল, 'বেশ, তাই কোরো।'

স্ত্রীর কোনও ইচ্ছায় বাধা সে দিবে না।...

—'এ টাকা তো তোমারই।'

সুকুমারী বলিল, 'কেন? তোমার নয় কেন?'

পঞ্চানন বলিল, 'এই রোজগারের পথ তো তুমিই খুলে দিয়েছো। চপ তৈরি করে' বিক্রি করার কথা আমি কোনো-দিন ভাবতেও পারতাম না।'

দিন দেখিতে দেখিতে পার হইয়া যায়।

মাসের পর মাস পার হইল।

বৎসর ঘুরিয়া গেল।

সুকুমারীর আবার একটি সন্তান হইল। এবার ছেলে নয়, মেয়ে।

কন্যার নাম হইল শঙ্করী।

শঙ্কর ও শঙ্করী।

শঙ্করী দেখিতে হইল ঠিক তাহার মায়ের মত সুন্দরী।

সুকুমারী বলিল, 'তোমার মেয়ের বিয়েতে টাকা খরচ হবে না দেখো।'

পঞ্চানন বলিল, 'কেন?'

সুকুমারী বলিল, 'এ মেয়েকে যে দেখবে সে-ই বিয়ে করতে চাইবে।'

এমনি করিয়া ছেলে-মেয়ে লইয়া মনের আনন্দে তাহারা দিন কাটাইতে লাগিল।

সুকুমারী ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে,—হে ভগবান, হে বিশ্বনাথ, বড়লোক হইতে সে চায় না, এমনি করিয়া দিনগুলা যেন তাহাদের পার হইয়া যায়। ছেলেটাকে লেখাপড়া শিখাইয়া যেন মানুষ করিয়া দিতে পারে, মেয়েটার যেন মনের মত একটি ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারে। আর কিছুই'সে চায় না। যাহা তুমি দিয়াছ, যথেষ্ট দিয়াছ, তোমার করুণার সীমা নাই।

আজ শুভদিন

এমনি করিয়া জীবনের ছোট আশা, ছোট আকাঙ্ক্ষা আর ছোটখাটো সুখ-দুঃখে সুদীর্ঘ পাঁচটি বৎসর অতিবাহিত হইল।

শঙ্করকে লেখাপড়া শিখাইয়া রীতিমত শিক্ষিত করিয়া তুলিবে—এই ছিল তাহার জীবনের আকাঙ্ক্ষা। অশিক্ষা মানুষকে অন্ধ করিয়া রাখে, অশিক্ষিত মানুষ পৃথিবীর অনেক কিছু আনন্দ হইতে বঞ্চিত হয়, ইহাই সুকুমারীর দৃঢ় বিশ্বাস। তাহার নিজের জীবন দিয়া সে তাহা উপলব্ধি করিয়াছে। তাহার নিজের ছেলে-মেয়েদের সে এই বিড়ম্বিত জীবন যাপন করিতে দিবে না।

গ্রামে বড় ইস্কুল নাই। ছোট একটি মাইনর-ইস্কুল টিম্‌টিম্‌ করিয়া চলে। শঙ্করকে সেইখানেই ভর্ত্তি করা হইয়াছে। গ্রামেরই এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক দূরের কোন্ এক এন্‌ট্রেন্স ইস্কুলে শিক্ষকতা করিতেন। সংসারের প্রয়োজনে এখন আর তাঁহার গ্রাম ছাড়িয়া অন্য কোথাও থাকিবার উপায় নাই। কাজেই সে শিক্ষকের চাকরিতে ইস্তফা দিয়া তিনি গ্রামে আসিয়া বসিয়াছিলেন। সম্প্রতি কিছু উপার্জ্জনের আশায় তাঁহার নিজেরই বাড়ীতে একটি বালিকা-বিদ্যালয় খুলিয়াছেন। নিজে বাড়ী বাড়ী গিয়া আজকালকার দিনে নারীশিক্ষার উপযোগিতা বুঝাইয়া ছোট ছোট কয়েকটি ছাত্রী সংগ্রহ করিয়াছেন। মাসিক এক টাকা বেতনে শঙ্করীকে সেইখানে দেওয়া হইয়াছে। শঙ্করীর মত নিতান্ত ছোট ছোট মেয়েরা

একা একা এতখানি পথ যাওয়া-আসা করিতে পারে না বলিয়া গ্রামের নাপিত-বৌ এই কাজটির ভার লইয়াছে।

সেদিন সকালে পরিষ্কার ইজের ফ্রক্ পরাইয়া শঙ্করীকে বালিকা-বিদ্যালয়ে পাঠানো হইয়াছে, শঙ্কর দাওয়ায় বসিয়া হাতের লেখা লিখিতেছে। তাহার এখনও ইস্কুল যাইবার সময় হয় নাই। চপ লইয়া পঞ্চানন, টোটা—সকলেই চলিয়া গিয়াছে ষ্টেশনের দোকানে। সুকুমারী রান্নাঘরে বসিয়া রান্না করিতেছে, বেলা তখনও খুব বেশি হয় নাই। কিন্তু পল্লী-গ্রামের সকাল। উঠানে রৌদ্র আসিয়া পড়িয়াছে। গাছে গাছে নানারকমের পাখী ডাকিতেছে। কাছেই রেল-ষ্টেশন। ন-টার প্যাসেঞ্জার ট্রেণখানা ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইল। শব্দ শুনিয়া বাড়ী হইতে সবই বুঝিতে পারা যায়। বাড়ীতে ঘড়ি নাই। ট্রেণের আওয়াজ শুনিয়া গ্রামের লোক কাজকর্ম্ম করে।

শঙ্কর বলিল, 'ন-টার ট্রেণ এলো মা, এবার আমি চান করি।'

সুকুমারী বলিল, 'হ্যাঁ বাবা, চান করো, আমার রান্নাবান্না সব হয়ে গেছে। খেয়েই ইস্কুলে চলে' যাবে। দেরি কোরো না।'

বই খাতা রাখিয়া, গামছা লইয়া শঙ্কর রান্নাঘরে আসিল তেল মাখিতে।

তেলের বাটিতে তেল ঢালিয়া দিয়া সুকুমারী বলিল, 'নিজে মাখতে পারবি, না মাখিয়ে দেবো?'

শঙ্কর সেটা পছন্দ করে না। তেল মাখাইয়া দিবে কি? নিজের সব কাজ নিজে করিয়া সকলের কাছে সে প্রমাণ করিতে চায়—সে যথেষ্ট বড় হইয়াছে। ইহাই তাহার স্বভাব।

কথাটা শুনিয়া সে তাহার মায়ের মুখের পানে এমনভাবে তাকাইল, যাহার অর্থ বুঝিতে সুকুমারীর দেরি হইল না। বলিল, 'বুঝেছি, আর অমন করে' তাকাতে হবে না।'

—'তেলের বাটি আমি ছুঁড়ে ফেলে দেবো এক্ষুনি। আর কখনও বলবে না বলো।'

সুকুমারী বলিল, 'ভুলে গিয়েছিলাম বাবা। ঘাট হয়েছে। কাব কখ্খনো বলবো না।'

শঙ্করের মুখে হাসি ফুটিল।

যেমন পারিল একটুখানি তেল মাখিয়া হাসিতে হাসিতে শঙ্কর পুকুরে চলিয়া গেল স্নান করিতে।

রান্নাঘরটা ঝাঁটা দিয়া পরিষ্কার করিয়া সুকুমারী দুই ভাই-বোনের ঠাঁই করিবার ব্যবস্থা করিতেছিল। শঙ্করী আসিল বলিয়া। আসিয়াই খাবার চাহিবে।

এমন সময় একটি লোক এদিক-ওদিক তাকাইতে তাকাইতে সদর দরজা দিয়া বাড়ীতে ঢুকিল।

সুকুমারী বলিয়া উঠিল, 'কে?'

লোকটি তখন উঠান পার হইয়া রান্নাঘরের সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। হাতের পুঁটুলিটি নামাইয়া বলিল, 'আমাকে

চিনতে পারবে কি সুকু। কতদিন গাঁ ছাড়া। সেই বিয়ের সময় এসেছো আর তো গেলে না সেখানে। আমি গোবিন্দ। গোবিন্দ ভটচাজ রে—। আমার মেয়ের জন্যে একটি পাত্রের সন্ধানে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এইদিকপানে এসেছিলাম, তাই বলি—আমাদের সুকুমারীকে একবার দেখেও যাই, আর এ-বেলাটা ওর ওখানেই চারটি—'

সুকুমারী বলিল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, খাবে বইকি গোবিন্দদা, তোমাকে আমি চিনতে পেরেছি। বাপের বাড়ীর কাকপক্ষীকে দেখলে মেয়েরা চিনতে পারে।'

—'তাই তো বলি সুকু, তোর তাহ'লে মনে আছে আমাকে ?'

সুকুমারী বলিল, 'মনে আছে গোবিন্দদা, একদিন তুমি আমাকে একটি গোলাপফুল দিয়েছিলে, আর-একবার তোমার বাড়ীর উঠোনে যে কুলের গাছটা আছে সেই গাছের পাকা কুল পাড়তে গিয়েছিলাম, তুমি বাড়ী ছিলে না, ফিরে এসেই বললে—'

গোবিন্দ কথাটা শেষ করিতে দিল না। হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, 'বলেছিলাম—চার পয়সায় পঁচিশটে কুল আমি বিক্রি করছি। কুল খেতে হয় তো পয়সা নিয়ে আয়গে।'

সুকুমারী হাসিতে হাসিতে বলিল, 'হ্যাঁ। ছাখো গোবিন্দদা, আমার সব কথা মনে আছে। বিয়ের পর থেকে

এখানে এমন আট্‌কা পড়ে' গেছি গোবিন্দদা, যে একটি দিনের জন্যেও এ-বাড়ী ছেড়ে কোথাও বেরুতে পারলাম না। কি করবো বলো—আমার একা ঘর। অথচ তোমাদের জন্যে আমার এমন মন কেমন করে।'

গোবিন্দ বলিল, 'তা তো করবেই দিদি। যতই হোক্, জন্মস্থান তো! —সুকুর ছেলে-মেয়ে ক-টি ?'

—'একটি ছেলে, একটি মেয়ে। এক্ষুনি আসবে তারা। দেখতে পাবে। মেয়ে ইস্কুলে গেছে। ছেলে ইস্কুলে যাবে।'

গোবিন্দ এদিক-ওদিক চাহিয়া বলিল, 'বাড়ীটি বেশ ভাল তো! বাঃ, গাছপালাও তো বেশ লাগিয়েছিস্ দেখছি।'

—'হ্যাঁ দাদা, শঙ্করের বাবার খুব সখ।'

গোবিন্দ তাহার পুঁটুলিটি অনেকক্ষণ হইতে নাড়াচাড়া করিতেছিল, কোথায় রাখিবে বোধকরি সেই কথাটা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিতেছিল না।

রান্নাঘরের একটা কুলুঙ্গি দেখাইয়া দিয়া সুকুমারী বলিল, 'ওটা ওইখানে রাখো গোবিন্দদা। রেখে তুমি চান করে' এসো। ঘাট-বাঁধানো খুব ভাল একটি পুকুর আছে—কাছেই। যাকে জিজ্ঞাসা করবে সে-ই দেখিয়ে দেবে।'

বোঁচকা রাখিয়া গোবিন্দ তাহার শতছিন্ন জামাটি খুলিল, তাহার পর তেল মাখিয়া গামছা লইয়া স্নান করিতে গেল।

এদিকে শঙ্করী আসিল। শঙ্কর আসিল।

বোঁচকাটি দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, 'ওটা কার মা ?'

সুকুমারী বলিল, 'তোমাদের মামার বাড়ীর গ্রাম থেকে এক ভদ্রলোক এসেছে।'

মামার বাড়ী তাহারা কখনও দেখে নাই। মামার বাড়ী সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত ধারণা তাহাদের আছে। দুরধিগম্য সে কোন্ রূপকথার রাজ্য!

শঙ্কর আরও যখন ছোট ছিল তখন জিজ্ঞাসা করিত, 'আমাদের মামার বাড়ী নেই মা?'

সুকুমারী বলিত, 'হ্যাঁ বাবা, আছে। তোমার মামার বাড়ী আছে, তোমার মামা আছে, মামীমা আছে, সেখানে তোমাদের একটি ভাই আছে।'

—'আমরা কখন যাবো মা সেখানে?'

এ-কথার জবাব দেওয়া সুকুমারীর পক্ষে শক্ত। কবে যে সে সেখানে যাইবে, যাইবে কি যাইবে না, তাহা সে নিজেও জানে না। কাজেই কথাটাকে কোনোরকমে চাপা দিয়া বলে, 'তোমার বাবার দোকান বন্ধ করে' দিয়ে তো যাওয়া যায় না বাবা, তাই যাওয়া হয় না।'

সুকুমারীর হঠাৎ মনে পড়ে তাহার দাদাকে। তাহার সেই স্নেহময় অগ্রজকে। এতদিনের মধ্যে একটিবারের জন্য যে তাহার সংবাদ পর্য্যন্ত লয় নাই, তাহার সম্বন্ধে একটা নিদারুণ অভিমানে তাহার সর্ব্ব অন্তঃকরণ ভরিয়া গেল।

স্বামীর বাড়ীতে তাহার শাশুড়ী-ননদ নাই তাই রক্ষা, থাকিলে হয়তো এই লইয়া—পিতৃগৃহের এই অনাদর-অবহেলার

সূত্র ধরিয়া কত যে অস্বস্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হইত—তাহা কল্পনা করিতেও কষ্ট হয়।

এখন আর সুকুমারীর বুঝিতে বাকি নাই যে, বৌদিদি তাহাকে চিরদিনের জন্য বিদায় করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে।

পাছে এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ উঠিয়া পড়ে তাই সে তাহার পিত্রালয়ের এই আগন্তুক গোবিন্দ ভট্চাজকে তাহার দাদা-বৌদিদি সম্বন্ধে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করে নাই।

ভগবান রক্ষা করিয়াছেন। সেও কিছু বলে নাই।

গোবিন্দ ভট্চাজ পুকুর হইতে স্নান করিয়া ফিরিল।

সুকুমারী জিজ্ঞাসা করিল, 'এত দেরি হলো যে গোবিন্দদা? পুকুরের রাস্তা খুঁজে পাওনি?'

গোবিন্দ বলিল, 'না না, এ তো শহর নয় যে, রাস্তা খুঁজে পাবো না! স্নান করে' আহ্নিক করলাম তাই দেরি হয়ে গেল। এই বুঝি তোমার ছেলে-মেয়ে?'

সুকুমার বলিল, 'হ্যাঁ দাদা।'

গোবিন্দ বলিল, 'ভিজে কাপড়টা আসতে আসতে শুকিয়ে গেল। এইটেই পরে' ফেলি।'

গোবিন্দ ভট্চাজ গামছা ছাড়িয়া কাপড় পরিতে লাগিল।

সুকুমারী এতক্ষণে তাহার দেরি হইবার হেতুটা বুঝিতে পারিল। রাস্তাও সে ভোলে নাই, আহ্নিকও করে নাই।

পরনের ধুতিখানা জলে কাচিয়া শুকাইয়া আনিয়াছে। দরিদ্র এই ব্রাহ্মণের বোধকরি আর দ্বিতীয় বস্ত্র নাই।

শঙ্কর ও শঙ্করী পাশাপাশি বসিয়াছিল। সুকুমারী গোবিন্দ ভট্‌চাজের জন্য আসন বিছাইয়া ঠাঁই করিতে গিয়া দেখিল, 'ছেলে-মেয়ে দু-জনেই মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছে।

—'হাসছিস্ কেন তোরা! ভাল হয়ে বোস্, একসঙ্গে সবাইকে খেতে দেবো।'

বাড়ীতে অতিথি আসিয়াছে, তাই সে ছেলে-মেয়েকে এখনও খাইতে দেয় নাই। অতিথি নারায়ণ! ছেলেমেয়েরা শিখুক।

কিন্তু সেই অতিথিকে দেখিয়াই তাহাদের এই হাসি!

মামার বাড়ীর লোক। তাহারা দু-জনেই ভাবিয়াছিল—দেখিতে কতই-না সুন্দর হইবে।

সুকুমারী বলিল, 'আবার হাসে! যাও, গোবিন্দদাকে প্রণাম করে' এসো!'

শঙ্করী চুপিচুপি বলিল, 'ঠিক ভগা ডোমের মতন চেহারা, নয় দাদা?'

শঙ্কর বলিল, 'বলতে নেই, চুপ্! মা বকবে।'

কথাটা সুকুমারী শুনিতে পায় নাই। সে তখন একটু দূরে বসিয়া ভাত বাড়িতেছিল।

শঙ্কর উঠিয়া দাঁড়াইল। শঙ্করীকে বলিল, 'কাপড় পরা হয়ে গেছে। আয় প্রণাম করবি।'

শঙ্করীকে দাদার পিছু পিছু যাইতে হইল।

গোবিন্দ তখন গামছাটি কাঁধে ফেলিয়া রান্নাঘরের দিকেই আসিতেছিল। শঙ্কর-শঙ্করী দু-জনেই তাহার কাছে গিয়া পায়ের কাছে হেঁট হইয়া প্রণাম করিল।

গোবিন্দ বলিল, 'প্রণাম করছো? বেশ, বেশ। বেঁচে থাকো। আহা, এ যে সোনার চাঁদ। বা বা, চমৎকার ছেলে-মেয়ে দুটি! তা, মা কেমন সুন্দরী, তার ছেলেমেয়ে সুন্দর হবে না তো হবে কার? খেয়েছো তোমরা?'

সুকুমারী বলিল, 'না দাদা, এসো তুমি। বোসো। একসঙ্গেই দেবো সবাইকে।'

—'আমাকে এত সকাল সকাল না দিলেও হতো!'...

বলিতে বলিতে গোবিন্দ ভট্‌চাজ তাহার নির্দ্দিষ্ট আসনে আসিয়া বসিল।

সুকুমারী বলিল, 'এদের জন্যে সকাল সকাল রান্না আমাকে করতেই হয় দাদা।'

প্রত্যেকের সুমুখে খাবার থালা ধরিয়া দিয়া সুকুমারী বলিল, 'যা দরকার হয় চেয়ে নিও গোবিন্দদা, লজ্জা কোরো না।'

লজ্জা সে সত্যই করিল না। শঙ্কর তাড়াতাড়ি খাইয়া ইস্কুল চলিয়া গেল। শঙ্করীর খাওয়া হইল। কিন্তু গোবিন্দর খাওয়া তখনও শেষ হইল না। খাইতে খাইতে শুধুই সে বলিতে লাগিল, 'আহা, সুকু রান্না করেছে ঠিক যেন অমৃত।'

—'আর চারটি ভাত তোমাকে দিই গোবিন্দদা।'

গোবিন্দ বলিল, 'দেবে? আচ্ছা, বলছো যখন—দাও!'

সে-ভাতও শেষ হইল।

সুকুমারী আবার দিতে চাহিল। গোবিন্দ এবারেও না বলিল না।

তাহার পর আবার।

তাহার খাওয়া দেখিয়া সুকুমারীর মনে হইল, ব্রাহ্মণ বোধকরি দু-তিনদিন অভুক্ত আছে।

গোবিন্দ উঠিয়া গেল। মানুষকে খাওয়াইয়া এত তৃপ্তি সুকুমারী বহুদিন পায় নাই।

হেঁসেল শূন্য দেখিয়া হাসিতে হাসিতে আবার সে ভাত চাপাইয়া দিল। পঞ্চাননের আসিতে এখনও দেরি আছে। তরকারি কম পড়িবে না। যদি পড়ে, আলু ভাজিয়া দিলেও চলিবে।

গোবিন্দ আঁচাইয়া আসিয়া বলিল, 'এইবার একখিলি পান দাও সুকুমারী। এমন খাওয়া অনেকদিন খাইনি। গাঁয়ে গিয়ে বলবো সবাইকে।'

—'দাদা-বৌদিকে গিয়ে বোলো।'—কথাটা বলিতে গিয়াও সুকুমারী বলিতে পারিল না। কতবার মনে হইয়াছে, দাদা-বৌদির কথা জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু একটি বারের জন্যও সে-কথা সে উচ্চারণ করে নাই।

তাহারা যেমন সুকুমারীকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে, সেও তেমনি তাহাদের ভুলিয়াছে। এইটাই তাহারা বুঝুক।

পান খাইয়া গোবিন্দ বলিল, 'আমি এইখানে একটু গড়িয়ে

নিই সুকুমারী। জামাই এলে আমাকে জাগিয়ে দিও—তোমাদের খাওয়া-দাওয়া হয়ে যাবার পর অবশ্য। আজই বিকেলে আমাকে বাড়ী ফিরতে হবে।'

*

* *

নিত্য নিয়মিত যেমন আসে, সেদিনও তেমনি পঞ্চানন আসিল বারোটার পর।

খাওয়া-দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করিয়া আবার সে ষ্টেশনে যায়। সেই অবসরে সুকুমারী নিজে খাইয়া, হেঁসেলের পাট তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া একটু বিশ্রাম করে। কোনোদিন-বা শঙ্করীর সঙ্গে গল্প করে।

সেদিন বাড়ীতে লোক আসিয়াছে। সুকুমারী ভাবিয়াছিল, গোবিন্দদার সঙ্গে গল্প করিবে।

তাই সে কাজকর্ম্ম সারিয়া এদিকের ঘরে আসিয়া দেখিল, পঞ্চানন আর শঙ্করী দু-জনেই খুব হাসিতেছে।

সুকুমারী জিজ্ঞাসা করিল, 'কি গো, মেয়ের সঙ্গে খুব যে হাসি হচ্ছে। কি হলো কি?'

গোবিন্দ একটা মাদুর বিছাইয়া শুইয়া ছিল বাইরের ঢাকা-বারান্দায়। সে যেন শুনিতে না পায় এমনিভাবে পঞ্চানন বলিল, 'শঙ্করী কি বলছে জানো? তোমার বাপের বাড়ীর ওই ভদ্রলোককে বলছে, ভগা ডোম।'

সুকুমারী বলিল, 'ওই কথা ও বলছে আর তুমি শুনে হাসছো ? ...হ্যাঁরে শঙ্করী !'

মায়ের ডাক শুনিয়া শঙ্করীর মুখের হাসি তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইয়া গেল। বুঝিতে পারিল—বলা তাহার অন্যায় হইয়াছে।

কথাটাকে সেইখানেই চাপা দিয়া পঞ্চানন উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'আমি চলি।'

—'দাঁড়াও। তোমার সঙ্গে গোবিন্দদা কথা বলবে।'

এই বলিয়া সুকুমারী বাহিরে আসিয়া দেখিল, গোবিন্দদার নাক ডাকিতেছে। ডাকিবার কথাই। উঠানের নিমগাছটার ঠাণ্ডা হাওয়ায় এখানে শুইলেই মানুষ ঘুমাইয়া পড়ে।

সুকুমারী ডাকিল, 'শঙ্করী !'

শঙ্করী ভয়ে ভয়ে মার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

সুকুমারী বলিল, 'গোবিন্দদাকে ডেকে তুলে দে। বল্—মামাবাবু ! বাবা চলে' যাচ্ছে। আপনি উঠুন।'

শঙ্করীকে কিছুই বলিতে হইল না। পায়ে হাত দিতেই গোবিন্দ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

পঞ্চানন তখন তাহার হাতকাটা সার্টটি গায়ে দিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

গোবিন্দ বলিল, 'তুমি তো আমাকে চিনবে না ভাই, বিয়ের পর থেকে তো শ্বশুরবাড়ীর সঙ্গে সম্বন্ধই নেই। ভেবেছিলাম, সুকুও আমাকে চিনতে পারবে না ! কিন্তু দেখলাম ও আমাকে চিনেছে ঠিক।'

পঞ্চানন একটু হাসিয়া বলিল, 'বাপের বাড়ীর মানুষ— মেয়েরা ঠিক চিনতে পারে। তা ধরুন, শ্বশুর-শাশুড়ী নেই, না থাক্, অনেকেরই থাকে না। কিন্তু আপনাদের সুকুমারীর দাদা তো রয়েছে। তার কি উচিত ছিল না—বিয়ের পর একখানা পোষ্টকার্ড লিখেও বোনের খোঁজ-খবর নেওয়া!'

গোবিন্দ বলিল, 'ছিল। একশো বার ছিল। কিন্তু—'

বলিয়া সুকুমারীর মুখের পানে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমাদের সব খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে?'

সুকুমারী তাহার মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিয়া বলিল, 'হ্যাঁ।'

গোবিন্দ বলিল, 'আমি সেইজন্মে অপেক্ষা করছিলাম সুকুমারী। কথাটা এসেই বলতে পারতাম, কিন্তু ভাবলাম— তোমাদের খাওয়া-দাওয়া চুকুক্, তার পর বলবো।'

সুকুমারী জিজ্ঞাসা করিল, 'কি কথা, গোবিন্দদা?'

গোবিন্দ একটা ঢোঁক গিলিল, একটু কেমন যেন ইতস্তত করিল, তাহার পর বলিল, 'তোমার দাদা মারা গেছে সুকুমারী।'

কথাটা সুকুমারীর বুকের ভিতর কেমন যেন ধ্বক্ করিয়া বাজিল। বলিল, 'কবে? কখন?'

গোবিন্দ বলিল, 'তা প্রায় মাসখানেক হয়ে গেল। আমরাই সব গিয়েছিলাম শ্মশানে। লোকটা খাটতো তো খুব। কোথায় যেন গিয়েছিল; সামান্ত জ্বর নিয়ে ফিরে

এলো। তারপর নিমোনিয়া হলো। ডাক্তার দেখলে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না।'

সুকুমারী তখন দেয়ালে ঠেস্ দিয়া বসিয়া পড়িয়াছে। দু-চোখ দিয়া দর্দর্ করিয়া জল গড়াইতেছে।

গোবিন্দ আবার বলিল, 'পাঁচথুপি আসছিলাম, তোমার বৌদিদি দাঁড়িয়েছিল তোমাদের বাড়ীর দোর-গোড়ায়। বললাম, সুকুমারীর বাড়ীর পাশ দিয়েই আমাকে যেতে হবে বৌ, কিছু বলবো সুকুমারীকে? তোমার বৌদিদি বললে— খবরটা তাকে জানিয়ে দিও। তাই বাড়ী ফিরে যাবার পথে ঢুকে পড়লাম এইখানে। বলি, চারটি খেয়েও যাই, আর অমনি—'

কথাটা সে শেষ করিল না।

ভাবিয়াছিল, খবরটা শুনিয়া সুকুমারী হয়তো অত্যন্ত কাতব হইয়া পড়িবে। হয়তো-বা পল্লীগ্রামের মেয়েরা যেমন চীৎকার করিয়া কাঁদে তেমনি কাঁদিতে বসিবে। কিন্তু কিছুই সে করিল না। আঁচলে চোখের জল মুছিয়া মেয়েটাকে কোলে তুলিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'দাদা তো আমার কাছে মরেই ছিল, আজ তার সত্যিকারের মরার খবর পেলাম। দাদা—'

বলিয়া আরও কি যেন বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু কণ্ঠস্বর তাহার এমনি কাঁপিয়া উঠিল যে, কথাটা শেষ করিতে পারিল না। উদ্গত আবেগ দমন করিবার জন্যই বোধকরি-বা তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়া ঢুকিল।

আজ শুভদিনে

*

*　　*

তুঃখশোকের লেশমাত্র ছিল না পঞ্চাননের এই সংসারে। সুকুমারী আসিবার আগে পঞ্চাননের জনমানবহীন এই বাড়ীটিকে অনেকে বলিত, 'পেঁচোর ভিটে'। সেই পঞ্চানন বিবাহ করিল। পেঁচোর ভিটেয় সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বলিল। বাড়ীটার লক্ষ্মীশ্রী ফিরিল। পঞ্চাননের রেল-ষ্টেশনের কারবার জমিয়া উঠিল। ক্রমশঃ পঞ্চাননের উন্নতি হইল। সুন্দর স্ত্রী, একটি রাজপুত্রের মত সুন্দর ছেলে, আর একটি রাজকন্যার মত মেয়ে লইয়া পঞ্চাননের দিন বেশ আনন্দেই কাটিতেছিল।

হঠাৎ একটা লোক আসিল। আগন্তুক গোবিন্দ ভট্চাজ। সে আসিয়াছিল একটি তুঃসংবাদ লইয়া। সুকুমারীর দাদার মৃত্যু-সংবাদ। এমন মৃত্যু-সংবাদ তো কতই আসে।

কিন্তু আনন্দময় একটি সংসারের উপর নিরানন্দের যে ছায়া পড়িল, সে ছায়া আর অপসারিত হইল না।

পঞ্চানন তাহার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোনও কাজই করে না। সেদিন ষ্টেশন হইতে ফিরিয়া পঞ্চানন বলিল, 'ত্যাখো সুকু, ষ্টেশন-মাষ্টারকে বলছিলাম তোমার দাদার এই মৃত্যুর খবরটা, তা তিনি কি বললেন জানো?'

সুকুমারী বলিল, 'কি বললেন?'

—'বললেন, আমার একবার যাওয়া উচিত।—আমাদের

খবর হয়তো সে নিতে পারেনি, কিন্তু তাই বলে' এই দুঃখের দিনে, খবরটা পেয়েও আমাদের চুপ করে' থাকা উচিত নয়।'

সুকুমারী জিজ্ঞাসা করিল, 'যাবে?'

—'তুমি যদি বলো তো যাই।'

সুকুমারী বলিল, 'তাহ'লে যাও।'

তাহাই স্থির হইল। একটিমাত্র দিনের জন্য যাওয়া আর আসা। যেদিন যাইবে, সেইদিনই ফিরিয়া আসিবে। দোকানে দু-জন লোক। নিশ্চয়ই চালাইয়া লইতে পারিবে।

সকালে পঞ্চানন দোকানে গিয়া সামান্য কিছু বেচাকেনা করিয়া তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিল। ন'টার সময় ট্রেণ ধরিবে বলিয়া স্নান করিয়া শঙ্করের সঙ্গে বসিয়া খাইয়া লইল। তাহার পর জামা-কাপড় পরিয়া জুতা পায়ে দিয়া বাড়ী হইতে যখন বাহির হইল, দেখিল ট্রেণ আসিয়া ষ্টেশনে ঢুকিতেছে। দেরি হইয়াছে। তা হোক্। কাছেই ষ্টেশন। এইটুকু পথ তাড়াতাড়ি গিয়া ট্রেণখানা ঠিক সে ধরিয়া ফেলিবে। গার্ডের হুইশল্ শোনা গেল। ইঞ্জিন সবে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। পঞ্চানন বলিষ্ঠ জোয়ান। গায়ে শক্তি আছে। কামরার হাতলটা ধরিতে পারিলে চলন্ত-ট্রেণে সে অনায়াসে চড়িয়া বসিবে। এই ভাবিয়া সে চলন্ত ইঞ্জিনের সুমুখ দিয়া লাইনটা পার হইতে গেল। পার সে নিশ্চয়ই হইত, কিন্তু দুর্দৈব যখন আসে তখন এম্‌নি করিয়াই আসে। হঠাৎ একটা

পাথরের কুচিতে পা হড়কাইয়া সে আছাড় খাইয়া পড়িল। পা দুইটা রহিল লাইনের উপর, আর দেখিতে দেখিতে নিমেষের মধ্যে তাহার সেই পায়ের উপর দিয়াই ইঞ্জিনের চাকা চলিয়া গেল।

চারিদিকে একটা হৈ-চৈ গোলমাল উঠিল। গাড়ী থামিয়া গেল। টোটা চপ বিক্রি করিতেছিল। সে ছুটিয়া আসিল। ষ্টেশন-মাষ্টার আসিলেন। গার্ড আসিলেন। ষ্টেশনের প্রতিটি লোক ছুটিয়া আসিল।

পঞ্চানন সকলের চেনা। সকলের প্রিয়পাত্র। সকলেই হায় হায় করিতে লাগিল।

*

* *

দুইটা ষ্টেশনের পরেই বড় শহর হাটিয়াগড়। সেখানে বড় বড় ডাক্তার আছে। দু-দুটা হাঁসপাতাল আছে। একটা রেল-কোম্পানীর। একটা সরকারী।

পঞ্চাননকে অবিলম্বে সেইখানে লইয়া যাইতে হইবে।

কাছের কলিয়ারী হইতে কিষণলাল একখানা মোটর আনাইয়া দিল। টোটা ডাকিয়া আনিল সুকুমারীকে। কাঁদিতে কাঁদিতে সুকুমারী ছুটিয়া আসিল। সঙ্গে আসিল শঙ্করী। শঙ্কর ইস্কুলে গিয়াছে। থাক্ সে ইস্কুলে—অত আর ভাবিতে পারে না।

আজ শুভদিন

সুকুমারী ষ্টেশনে আসিয়া দেখিল, পঞ্চাননের সর্ব্বাঙ্গ লাল··· রক্তে রাঙা। যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে। জ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছে। সুকুমারীকে সে চিনিতেও পারিল না। কথাও বলিল না।

সংজ্ঞাহারা পঞ্চাননকে লইয়া সুকুমারী গাড়ীতে গিয়া উঠিল। টোটা সঙ্গে যাইতে চাহিয়াছিল। সুকুমারী বলিল, 'না, তুমি থাকো। শঙ্কর ইস্কুল থেকে এসে কান্নাকাটি করবে। তাকে তোমাদের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে রেখো।'

ষ্টেশন-মাষ্টারের ষ্টেশন ছাড়িয়া যাইবার উপায় নাই। তিনি জংসন-ষ্টেশনে টেলিগ্রাফ করিয়া দিলেন। রেলের হাঁসপাতালে পঞ্চাননের চিকিৎসা করিবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন।

তাহাদের সঙ্গে গেল কয়লার ডিপোর মালিক কিষণলাল। চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে বিশেষ বিলম্ব হইল না। বড় বড় ডাক্তারেরা দেখিলেন। পঞ্চাননের একটা পা কাটিয়া ফেলিতে হইল হাঁটু পর্য্যন্ত। আর-একটা পায়ের নীচের দিকে খানিকটা। শরীরের আর কোথাও কোনও চোট লাগে নাই।

সুকুমারীকে ডাক্তারবাবুর স্ত্রী ও কন্যা তাঁহাদের বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিলেন। ঘনঘন টেলিফোনে খবর আসিতেছিল।

শঙ্কর টোটাদের বাড়ীতে গিয়া থাকিতে চায় নাই। তাই বাধ্য হইয়া সন্ধ্যার ট্রেণে শঙ্করকে লইয়া টোটাকে হাটিয়াগড়ে আসিতে হইল।

আজ শুভদিন

হাঁসপাতাল হইতে টেলিফোনে খবর আসিল—পঞ্চাননের জ্ঞান ফিরিয়াছে। রাত্রি তখন বারোটা। সুকুমারী তাহাকে দেখিতে যাইবার জন্য উতলা হইয়া পড়িল। শঙ্কর-শঙ্করী তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

সুকুমারী বলিল, 'আমাকে একটিবার নিয়ে চলুন ডাক্তারবাবু। আমাকে না দেখলে ও নিজেকে খুব অসহায় বোধ করবে।'

ডাক্তারবাবু বলিলেন, 'আজ না। আমি হাতজোড় করে' অনুরোধ করছি আপনাকে। কাল সকালে আমি নিজে আপনাকে নিয়ে যাবো।'

সুকুমারী জিজ্ঞাসা করিল, 'কিন্তু ও বাঁচবে তো ডাক্তারবাবু?'

ডাক্তারবাবু বলিলেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, বাঁচবে।'

সুকুমারী বলিল, 'আমি আপনার মেয়ের বয়েসী, আপনি আমাকে 'আপনি' বলবেন না। 'তুমি' বলুন।'

—'বেশ মা, তুমিই বলছি। তুমি ভেবো না মা, তোমার স্বামী বাঁচবে।'

তারপর চলিল যমে-মানুষে টানটানি।

পঞ্চাননকে থাকিতে হইবে হাঁসপাতালে। অথচ ডাক্তারের বাড়ীতে ছেলে-মেয়ে লইয়া সুকুমারীর থাকা চলে না।

আজ শুভদিন

গ্রামের বাড়ীতে সে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু ছোট দুটি ছেলে-মেয়ে লইয়া একা সে থাকিবে কেমন করিয়া?

টৌটা বলিল, 'আমার মাকে ডেকে আনি। আমরা থাকবো বৌদি।'

তাহাই হইল। টৌটার মা আসিয়া থাকিল সুকুমারীর কাছে। শঙ্কর-শঙ্করী আবার তেমনি ইস্কুলে যাইতে লাগিল। আর সুকুমারীর কাজ হইল রোজ একবার করিয়া ট্রেণে চড়িয়া হাটিয়াগড় হাঁসপাতালে যাওয়া আর আসা। কোনো-দিন শঙ্করকে লইয়া যায়, কোনোদিন-বা শঙ্করীকে। সঙ্গে যায় টৌটা।

ষ্টেশনের দোকান একরকম বন্ধ। কোনোদিন খোলা হয়, কোনোদিন হয় না।

আয় নাই। অথচ খরচ চলিতে থাকে।

পঞ্চানন বলে, 'কি হবে সুকু? এ কি হলো আমার?'

সুকুমারীও ঠিক সেই একই কথা ভাবিতেছে। তবু সে তাহাকে সাহস দিয়া বলে, 'ও-সব ভেবো না তুমি; অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে। তুমি যে বেঁচে উঠেছো এই আমার যথেষ্ট।'

পঞ্চাননের দুই চোখ জলে ভরিয়া আসে। বলে, 'কিন্তু এরকমভাবে বেঁচে থেকে কি করবো আমি? কি ভেবে-ছিলাম, আর কি হয়ে গেল ছাখো।'

—'সব অদৃষ্ট। মানুষ কিছুই করতে পারে না।'

—'বোধহয় তাই।' পঞ্চানন বলে, 'নইলে আমারই-বা অমন ভুল হবে কেন?'

*

* *

পাঁচমাস লাগিল পঞ্চাননের পায়ের ঘা শুকাইতে।

তাহার পর অনেক টাকা দাম দিয়া তাহার বাঁ-পায়ের জন্য একপাটি বুটজুতা তৈরি করাইতে হইল। আর তৈরি করাইতে হইল দুইটা ক্রাচ্।

দুই হাতে দুইটা ক্রাচ্ লইয়া হাঁটিতে গিয়া পঞ্চানন কাঁদিয়া ভাসাইল।— 'চিরজন্মের মত এই শাস্তি তুমি আমাকে কেন দিলে ভগবান! ···তোমাকে আমি বিয়ে করে' শেষপর্য্যন্ত এই শাস্তি দিলাম সুকু!'

সুকুমারী বলিল, 'আবার তুমি ওইসব কথা বলছো?'

পঞ্চানন বলিল, 'বলবো না? এই যে ফুলের মত সুন্দর তোমার দুটি ছেলে-মেয়ে—কি অপরাধ ওরা করেছিল?'

সুকুমারী বলিল, 'ওদের জন্যে কেন তুমি অত ভাবছো গো? যে-যার বরাত নিয়ে আসে পৃথিবীতে। যিনি ওদের পাঠিয়েছেন, তিনিই রক্ষে করবেন জেনো। মনে নেই, তুমি একদিন বলেছিলে, ওরা পথ ভুলে এসেছে তোমার কাছে, ওদের বরাতে অনেক দুঃখু আছে। আমি বলেছিলাম, না দুঃখু নেই। দেখো ঐ ছেলে আমার রাজা হবে। তুমিই

বলো না, মা-বাপের আশীর্ব্বাদ যে ছেলের ওপর থাকে সে কি কখনও দুঃখ-কষ্ট পায়? না, পায় না। ওদের জন্যে তোমায় অত ভাবতে হবে না।' এই সব কথা বলিয়া কোনোরকমে সান্ত্বনা দিয়া সুকুমারী তাহাকে হাঁসপাতাল হইতে ঘরে আনিল।

কিন্তু উপার্জ্জন? টোটা রাজী ছিল দোকান চালাইতে। কিন্তু তাহার মা রাজী হইল না। বলিল, 'না বাছা, ও আমার অন্ধের নড়ি, বিধবার ছেলে, ওর বিয়ে-থা দিয়ে ঘর-সংসার করবার ইচ্ছে আছে আমার। তোমার ও অ-পয়া দোকান ওকে আমি আর করতে দেবো না।'

সুকুমারী বলিল, 'অপয়া কেমন করে' হলো, খুড়ীমা?'

খুড়ীমা বলিল, 'নিজেই বুঝে ছাখো বাছা, ও আর মুখ ফুটে কত বলবো। তোমার এই বাড়ীটাকে সবাই বলতো, ভূতের বাড়ী···বলতো, পেঁচোর ভিটে। পাঁচুর ঠাকুরদাদার ওপর ব্রহ্মশাপ ছিল, সবাই বলতো এ-ভিটেতে কখনও সন্ধ্যে-পিদীম জ্বলবে না। তুমি ছিলে লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে, তাই তোমার জোরে বছরকতক্ খুব বাড়বাড়ন্ত দেখলাম, তারপর ছাখো কি হলো। তোমার এয়োতির খুব জোর তাই পাঁচু রেলগাড়ীর তলায় পড়েও প্রাণে বেঁচে রইলো। না বাছা, আমি অনেক ভেবে দেখলাম, আর না।'

সুকুমারী অন্য লোক দিয়া দোকানটি চালাইবার অনেক চেষ্টা করিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না।

আজ শুভদিন

*

*　　*

নিরুপায় পঞ্চানন একদিন ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মের উপর দাঁড়াইয়াছিল। একখানা ট্রেণ আসিয়া দাঁড়াইল। এই ট্রেণে যাহারা প্রতিনিয়ত যাওয়া-আসা করে তাহাদের অনেকেই পঞ্চাননের এই ভাগ্যবিপর্য্যয়ের কথা জানে। সেদিন কে একজন দয়া করিয়া তাহার পায়ের কাছে একটি আনি ছুঁড়িয়া দিল। তাহার দেখাদেখি আরও দু-একজন তেমনি করিয়া তাহাকে কিছু ভিক্ষা দিয়া গেল।

হা ভগবান! নিয়তির কি নিষ্ঠুর পরিহাস! শেষপর্য্যন্ত ভিক্ষাই হইবে তাহার উপজীবিকা! ইহা ছাড়া আর কোনও পথ সে দেখিতে পাইল না।

রোজই সে ট্রেণ আসিবার সময় প্ল্যাটফর্ম্মে গিয়া দাঁড়ায়। কাহারও কাছে মুখ ফুটিয়া 'কিছু দাও' বলিয়া হাত পাতিতে তাহার মাথা কাটা যায়, তবু সে কিছু পাইবার আশায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

না চাহিলে পাওয়ার আশা বৃথা। শেষপর্য্যন্ত তাহাকে চাহিতেই হয়।

এবং এই ভিক্ষাবৃত্তির মজাই এই যে, একবার যদি কেহ মানুষের কাছে হাত পাতিয়া মাথা হেঁট করিয়া বসে তো

সে আর জীবনে কোনোদিন তাহার সে নীচু মাথা সোজা করিতে পারে না। মাথা তাহার চিরদিনের জন্য হেঁট হইয়াই থাকে।

শেষে প্রত্যহ দেখা যায়, পঞ্চানন হাত পাতিয়া ভিক্ষা করিতেছে।

সুকুমারী লজ্জায় আর ঘরের বাহির হইতে পারে না।

সে-বৎসর আশ্বিন মাসে নামিল প্রচণ্ড বর্ষা।

বর্ষায় ট্রেণ চলাচল যেমন বন্ধ হয় না, পঞ্চাননের ভিক্ষাও তেমনি বন্ধ করিলে চলে না। নিত্য-নিয়মিত ট্রেণও প্ল্যাটফর্ম্মে আসিয়া দাঁড়ায়, আমাদের পঞ্চাননকেও ঠিক সেই সময় আসিয়া দাঁড়াইতে হয়। ছাতা মাথায় দিয়া ভিক্ষা করিলে চলে না; দু-হাতে দুটি ক্রাচ্, ছাতি ধরিবার উপায় নাই। অপরের সাহায্য ছাড়া ক্রাচ্ লইয়া সরাসরি কামরার ভিতরে ঢুকিতে পারে না। কাজেই বৃষ্টিতে ভিজিয়া ভিক্ষা চাহিতে হয়। যাত্রীদের অপরিসীম দয়া না হইলে কেহ সার্সি তুলিয়া ভিক্ষা দেয় না। এক-একদিন পঞ্চাননের বৃষ্টিতে ভেজাই সার হয়। ভিক্ষা যাহা পায় তাহাতে তাহার দিন চলে না। এমনি করিয়া উপর্য্যুপরি বৃষ্টিতে ভিজিয়া পঞ্চানন জ্বরে পড়িল।

পঞ্চাননের উদ্বেগের আর সীমা রহিল না। জ্বরের উদ্বেগ নয়, ভিক্ষায় বাহির হইতে না-পারার উদ্বেগ। দিবারাত্রি বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিল আর বলিল, 'কি হবে?'

তাহার এ-প্রশ্নের জবাব দিবে কে?

সুকুমারী চোখের জলে বুক ভাসাইল। শেষে অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া স্থির করিল, হাঁসপাতালের সেই দয়ালু ডাক্তার আর তাঁর দয়াময়ী স্ত্রীকে মিনতি করিয়া স্বামীর বর্ত্তমান অবস্থার কথা লিখিয়া জানায় যে, একবার তাঁর অসীম অনুগ্রহে মরণোন্মুখ স্বামীর প্রাণ ফিরাইয়া পাইয়াছিল, এবার যদি একটিবারের জন্য তিনি আসিয়া তার স্বামীকে দেখিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া যান তাহা হইলে সে আবার পৃথিবীর বুকে মাথা গুঁজিবার একটু ঠাঁই করিয়া লইতে পারে। নহিলে…

ভাবিল বটে, কিন্তু সে তো লিখিতে জানে না। শঙ্করকে দিয়া কোনোমতে লিখাইলেও, পত্রখানা লইয়া যাইবে কে? এ উপকার করিতে পারিত একমাত্র টোটা। কিন্তু তার মা সেদিন যেসব কথা বলিয়া গিয়াছে… একদিকে শঙ্কর আর একদিকে শঙ্করীকে চাপিয়া ধরিয়া সে শুধু ভগবানকে ডাকিতে লাগিল।

ভগবান আর-কিছু না করুন, পঞ্চাননকে তাহার এই মারাত্মক দুশ্চিন্তার হাত হইতে নিষ্কৃতি দিলেন। প্রবল জ্বরের ঘোরে তাহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল।

পঞ্চাননের হারানো সংজ্ঞা আর ফিরিয়া আসিল না।

পাঁচদিনের দিন সব শেষ হইয়া গেল।

আজ শুভদিন

সুকুমারীর চোখের সুমুখে এ পৃথিবীর রঙ, রূপ, রস, আলো—সব-কিছু মনে হইল যেন এক মুহূর্ত্তে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে।

ওর অন্তরে বাহিরে শুধু নিবিড় নিরন্ধ্র অন্ধকার। অন্ধের মত এই অন্ধকার হাতড়াইয়া পেটের কাঁটা ছেলে-মেয়ে দুটিকে লইয়া ও এখন কি করিবে, কোন্ পথে যাইবে?

সুকুমারী জানে না যে, অন্ধের প্রতিই দয়াল ভগবানের করুণা অপরিসীম। এ-জগতে চক্ষুষ্মান্ লোকেরাই খানায় পড়ে। দুই চক্ষুহীন অন্ধের—খানায় বা গর্ত্তে পড়িয়া অপঘাতের দৃষ্টান্ত জগতে বিরল। সুকুমারীর যা হইয়া গেল, নিয়তির লীলাচক্রের আবর্ত্তনে পৃথিবীর এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্তের মধ্যে নিত্য-নিয়মিত এমন কাণ্ড যে কত ঘটিতেছে কে তাহার হিসাব রাখে? সৃষ্টির সম্পদ বাড়াইবার জন্য ভগবান যাঁহাদের পৃথিবীতে পাঠাইয়া দেন, কাজ শেষ হইলেই তাহাদের আবার কাছে টানিয়া লন্। আবার সৃষ্টির কাজ অব্যাহত রাখিবার জন্য যাহাকে রাখার প্রয়োজন, নানা দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়া তাহাকে তাহার প্রাক্তন ভোগ করিবার ও সহ্য করিবার শক্তি তিনিই দিয়া থাকেন। সুকুমারীর বেলায়ও তাহার ব্যতিক্রম হইল না। অনন্ত শূন্য খাঁ-খাঁ বালুকাময় মরুভূমির পথে তৃষ্ণায় কণ্ঠাগতপ্রাণ পথিককে মরীচিকা-স্নিগ্ধ মরূদ্যান দেখার দিব্যদৃষ্টি দিয়া সুকুমারীকে তিনি পথ দেখাইয়া দিলেন।

আজ শুভদিন

*

* *

সুকুমারী তাহার ছেলে-মেয়েকে সঙ্গে লইয়া স্বামীর ভিটা পরিত্যাগ করিয়া একদিন সকালে মাধবডি গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সুকুমারীর দাদার স্ত্রী—বিধবা বৌঠাকরুণ কুমু তখন স্নান করিয়া উনান ধরাইয়া রান্নার ব্যবস্থা করিতেছিল, পায়ের শব্দে মুখ তুলিয়া দেখিল, সুকুমারী তাহার ছেলেটিকে আর মেয়েটিকে সঙ্গে লইয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সুকুমারীর বিধবা হওয়ার সংবাদ সে পাইয়াছে, এবং সংবাদ পাইয়া অবধি এই আশঙ্কাই সে করিতেছিল। তবু কি আর করে, বাড়ীতে মানুষ আসিলে সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দেওয়া তো আর চলে না; কাজেই একবার নিতান্ত যেন না বলিলে নয় এমনিভাবে সে জিজ্ঞাসা করিল, 'এলে ঠাকুরঝি? এসো।'

বলিয়াই সে মুখ নামাইয়া নিজের কাজে মন দিল।

বিধবা হইবার পর কুমুর সঙ্গে সুকুমারীর এই প্রথম দেখা। ভাবিয়াছিল, হয়তো তাহাকে একটুখানি কাঁদিতে হইবে। চোখ দুইটাও তাহার জলে ভরিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু কুমুর মুখের ভাব দেখিয়া চোখের জল তাহার চোখেই শুকাইয়া গেল।

সেদিন কিন্তু কোনও কিছুরই ব্যতিক্রম ঘটিল না। খিড়কির পুকুরে সুকুমারী স্নান করিয়া আসিল, ছেলে-মেয়ে দুটাকে স্নান করাইল। তাহার পর রান্না শেষ হইলে কুমু বলিল, 'ছেলেদের আগে খাইয়ে নাও ঠাকুরঝি, তারপর তোমাকে দেবো, না কি বলো?'

সুকুমারী বলিল, 'তাই দাও।'

দিনের বেলা আহারাদি চুকিলে পর, সুকুমারী ভাবিয়াছিল, কুমুর সঙ্গে দু'দণ্ড বসিয়া সুখ-দুঃখের আলোচনা করিবে, কিন্তু শেষপর্যান্ত তাহাও আর হইয়া উঠিল না। ছেলেটাকে খাওয়াইয়া, নিজে খাইয়া মুখে পান ও হাতে দোক্তা লইয়া কুমু বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

কপাল ঠুকিয়া এখানে সে আসিল বটে, কিন্তু আসিয়া অবধি সুকুমারীর বড় লজ্জা করিতেছিল। দাদা থাকিলেও-বা এখানে তাহার জোর ছিল, কিন্তু এখন আর জোর তাহার সাজে না। বৌ-ঠাকৃরুণের গলগ্রহ হইয়া থাকিবার ইচ্ছাও তাহার নাই। অথচ কি যে সে করিবে, এখনও তাহা সে নিজেও জানে না। কাহারও বাড়ীতে রাঁধুনী কিম্বা ঝি-চাকরাণীর কাজও যদি সে পায়, তাহাও সে করিতে পারে। কুমুর সঙ্গে সুকুমারী সেই পরামর্শই করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু সেদিন তাহার সে সুযোগ কিছুতেই মিলিল না।

না মিলুক, তাহার জন্য এত তাড়াতাড়িই-বা কিসের!

দাদা তাহার আর-কিছু রাখিয়া না যাক্, জমি-জায়গা বেশ ভালই রাখিয়া গেছে।

*

* *

কুমু প্রত্যহ দুবেলা রান্না করে, সুকুমারী রোজই বলে, 'তুমি ওঠো বৌদি, রান্না আমি করি।'

কিন্তু কুমু কিছুতেই উনানের কাছ হইতে উঠিয়া বসে না। ঘাড় নাড়িয়া বলে, 'না, থাক্ ঠাকুরঝি, তুমি আর ক'দিনের জন্যে এসেছো, এই ক'জনের রান্না, এ আমিই পারবো।'

সুকুমারী সরিয়া দাঁড়াইল।

সরিয়া দাঁড়াইল—রান্না করিতে হইবে না বলিয়া নয়, নিরিবিলি একটুখানি চুপ করিয়া বসিয়া কুমুর এই কথাটা ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিবার জন্য। তবে কি সে সত্যই ভাবিয়াছে—চিরকালের জন্য এখানে সে থাকিতে আসে নাই?

সুকুমারী ভাবিল, এমন করিয়া কুমুকে কোনও কথা না বলা তাহার ভাল হইতেছে না। শ্বশুরবাড়ীর সমস্ত সম্পর্ক চুকাইয়া দিয়াই সে যে এখানে আসিয়াছে, সেই কথাটা আজ সে তাহাকে যেমন করিয়া হোক্ বলিবে।

কুমুর রান্না তখনও শেষ হয় নাই, সুকুমারী তাহার কাছে গিয়া বসিল। একবার এদিক-ওদিক চাহিল, একবার

একটা ঢোক্ গিলিল, মাথার চুলগুলা হাত দিয়া একবার ঠিক করিয়া লইল, তাহার পর অতিকষ্টে উচ্চারণ করিল, 'বৌদি!'

কুমু তাহার মুখের পানে ফিরিয়া তাকাইল। তাকাইয়াই দেখে, চোখ দুইটা তাহার ছলছল করিতেছে। ব্যাপার কি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কুমু জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হলো?'

'হয়নি কিছু। আমি বলছিলাম···এই···বলছিলাম··· শঙ্করার বাবা কেমন করে' দিন চালাতো তা তো তুমি জানো বৌদি, মাটির একখানি ঘর···তাও আসবার সময় ভাবলাম কাউকে বেচে দিয়ে যাই, কিন্তু বলবো কি বৌদি, কেউ নিলে না। তা অমনি রইলো পড়ে, আমরা কোনোরকমে চলে এলাম।' এই পর্য্যন্ত বলিয়া সে একটুখানি থামিল। থামিয়া আবার বলিল, 'আদমপুর থেকে পাঁচ পয়সার টিকিট করে' বাকুলে পর্যন্ত ট্রেণে চড়ে' এসেছি, তারপর বলবো কি লজ্জার কথা, লোককে বললাম বটে এই ইষ্টিশান থেকে হেঁটে এসেছি, কিন্তু তা তো আসিনি; সেই বাকুলে থেকে এই এতখানি রাস্তা হেঁটেই এলাম।—তা আমি বলছি কি বৌদি, এই দুটো ছেলে-মেয়ে নিয়ে আমি ওখানে আর কেমন করে' থাকি, তাই এই তোমার হাতে ধরে'—

এই বলিয়া তাহার হাত দুইটা বাড়াইয়া সে কুমুর এক-খানা হাত চাপিয়া ধরিতে গেল। কুমু কিন্তু সেই অবসরে

উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'তা, আমার অবস্থাও তো সবই তুমি জানো ঠাকুরঝি, ছেলেটাকে নিয়ে আমার যে কেমন করে' চলবে তাই ভাবছি।'

সুকুমারী বলিল, 'আমার শরীরে শক্তি আছে বৌদি, দুখ-ভিখ করে' কোনোরকমে চালাবো তুমি দেখে নিও।— আমার আর কোনও উপায় নেই বৌদি, আমি একেবারে সেই যাকে বলে পথের-কাঙাল। তাই তোমার কাছে—' বলিতে বলিতে সে ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

কুমু বলিল, 'বেশ, তাই থাকো ঠাকুরঝি, যাবে আর কোথায়।'

তাহার পরদিন হইতে সুকুমারীর মুখে কুমুর সুখ্যাতি যেন আর ধরে না। সেখানে-সেখানে যার-তার কাছে শুধু এই কথাই সে বলিয়া বেড়ায় যে, এমন ভাজ-বৌ সহজে কাহারও হয় না। কুমুর মত ভাজ সে শুধু তাহার বরাত-জোরে পাইয়াছে, তাহা না হইলে আজ সে তাহার এই ছেলে-মেয়ে দুইটার হাত ধরিয়া কোথায় গিয়া যে দাঁড়াইত, কি দুর্গতি যে তাহার হইত, সেকথা জানেন শুধু তাহার অন্তর্যামী।

তাহার কথা শুনিয়া প্রতিবেশিনী দু-একজন মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসে আর বলে, 'ভাল। ভাল হলেই ভাল। এমনি ভাল যেন সে চিরকাল থাকে সুকু।'

সুকুমারী বলে, 'তা ভাই, মন্দ যদি হয় তো হবে আমার কপাল দোষে।'

আজ শুভদিন

*

* *

গ্রামে আসিয়াই সুকুমারী শুনিয়াছে, সুরবালা এখানে নাই, গত ফাল্গুন মাসে সে তাহার শ্বশুরবাড়ী গিয়াছে। এবার বোধকরি একবার আসিতেও পারে।

কবে আসিবে তাহার কোনও সংবাদ আসিয়াছে কি-না জানিবার জন্যই সুকুমারী সেদিন সুরবালাদের বাড়ী গিয়াছিল। সুরবালার মা বলিল, 'না মা, কই, চিঠিপত্তর তো কিছু লেখেনি।'

কথাটা সে এমনভাবে বলিল, সুকুমারীকে যেন সে ভাল করিয়া চেনেই না। অথচ সেই সুরবালা, সেই সুকুমারী।

অতীত দিনের প্রতিটি কথা সুকুমারীর মনে পড়িল। ভাবিয়াছিল, সুরবালার মাও হয়তো সেকথা তুলিবে, কিন্তু একটি কথাও সে বলিল না।

সুকুমারী বলিল, 'এবার চিঠি যখন তুমি ওকে লিখবে সই-মা, তখন আমার কথা যেন লিখে দিও। আমি এসেছি শুনলেই ও চলে' আসবে, দেখো।'

সুরবালার মা ঘাড় নাড়িয়া তাহার সম্মতি জানাইল।

শঙ্করীকে কোলের কাছে লইয়া সুকুমারী তখনও বসিয়াছিল, এমন সময় ঝি আসিয়া সুরবালার মাকে সংবাদ দিল—

ক্ষ্যান্ত-বাম্‌নী তাহার মেয়ের বাড়ী গিয়াছে, সুতরাং মুড়ি ভাজিবার জন্য একটা লোক দেখিতে হইবে।

কথাটা সুকুমারী শুনিল। শুনিয়াই সুরবালার মা'র মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, 'মুড়ি তো আমিই ভেজে দিতে পারি সই-মা।'

সই-মা বলিল, 'অত অত মুড়ি ভাজতে তুই কি পারবি সুকুমারী?'

'কেন পারবো না সই-মা, খুব পারবো, চলো।'

বলিয়া সেখান হইতে উঠিয়া গিয়া সুকুমারী মুড়ি ভাজিতে বসিল।

জমিদার-বাড়ীর মুড়ি ভাজা! শেষ আর কিছুতেই হইতে চায় না।

শেষ যখন হইল, বেলা তখন ছ'পহর গড়াইয়া গেছে।

মুড়ির প্রকাণ্ড ধামাটা ঘরের মেঝের উপর নামাইয়া সুকুমারী বলিল, 'কই গো বৌদি, দেখে যাও আজ কত রোজগার করলাম।'

কুমু কাছে আসিয়া দাঁড়াতেই সুকুমারী বলিল, 'মুড়িগুলো তুলে রাখো, আর এই নাও।' বলিয়া আঁচলের খুঁট হইতে চক্‌চকে একটি ছ'আনি গিঁট খুলিয়া বাহির করিয়া কুমুর হাতে দিয়া বলিল, 'আটসের ভাজানো ভাজলাম সেই সকাল থেকে। আট সেরে আট পয়সা, আর এই এতগুলো মুড়ি।'

মুড়ি পাইয়া, পয়সা পাইয়া কুমু যে খুশী হইল না তাহা নয়। দু'আনিটি নির্ব্বিবাদে নিজের খুঁটে বাঁধিয়া মুড়িগুলা সে ঘরের ভিতর রাখিতে গেল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, 'অনেক বেলা হয়েছে ঠাকুরঝি, তাড়াতাড়ি চান করে' চারটি খেয়ে নাও।'

সুকুমারী সেদিন ভাবিয়াছিল, লোকের বাড়ী এমনি মুড়ি যদি সে রোজ ভাজিতে পায় তাহা হইলেও-বা তাহাদের দুঃখের কতকটা অবসান হইতে পারে। ছোট একটা ছেলে, একটা মেয়ে আর সে নিজে। তিনজনের কতই-বা খরচ!

কিন্তু পল্লীগ্রামে মুড়ি যাহাদের প্রয়োজন তাহারা নিজেই ভাজিয়া লয়, শুধু বাবুদের বাড়ীর মুড়ি অন্য লোকে ভাজে। সই-মা বলিয়াছিল—'তা মাসে এমনি তিন-চার বার ভাজতে হয় মা!'

দিন-সাতেক পরে সুকুমারী আবার যেদিন সন্ধান লইতে গেল, শুনিল, সেই ক্ষেন্তি-বাম্‌নী বলিয়া যে মেয়েটা মুড়ি তাহাদের চিরকাল ভাজে, সে তাহার মেয়ের বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে এবং নিজের কাজ সে অন্য কাহাকেও দিতে চায় না।

সুকুমারী নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিল।

কুমু জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হলো ঠাকুরঝি?'

সুকুমারী বলিল, 'না বৌদি, হলো না। ক্ষেন্তি-বামনী নিজেই ভাজছে দেখে এলাম। কিন্তু এই আমি বলে' রাখলাম বৌদি, আমার সই একবার এলে হয়, তখন দেখো আমি কি করবো। ওদের ঠাকুরবাড়ীতে যে বামুনটা রাঁধে না, তাকে দেবো ছাড়িয়ে। ছাড়িয়ে আমি নিজে ওই রান্নার কাজটা নেবো। পাঁচ-ছ'জনের রান্না একবেলা, আর একবেলা ছুটি। মাইনে কত জানো বৌদি? খাওয়া-দাওয়া, কাপড়-চোপড় বাদে দশ টাকা মাসে।'

কুমু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'তা যদি হয় তো বেশ ভালই হবে ঠাকুরঝি। সই এলে বেশ ভাল করে' বোলো।'

—'ভাল করে' বলতে হবে না বৌদি, এমনি যদি বলি যে, আমার ভারি কষ্ট হয়েছে সই, তাহ'লেই হবে।' এই বলিয়া কিছুক্ষণ থামিয়া সুকুমারী বলিল, 'তা তুমি যাই বলো বৌদি, ছেলেবেলা ভাগ্যিস ঐ বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে ভাব করে' সই পাতিয়ে রেখেছিলাম। দুঃখের দিনে তবু একটা হিল্লে হলো।'

সুরবালা যে সুকুমারীর বাল্যকালের বন্ধু সেকথা কুমু বেশ ভাল করিয়াই জানে। কাজেই কথাটা চট্ করিয়া বিশ্বাস করিতে তাহারও বাধিল না। বলিল, 'সেই যে

কথায় আছে না ঠাকুরঝি, হয় নিজে বড়লোক হই, নয় তো বড়লোকের কাছে থাকি—তা সুরবালাকে তেমন করে' ধরে' বসলে তোমার হিল্লে একটা হবেই।'

অথচ এই কুমুই একদিন বাদ সাধিয়াছিল। সুরবালার বাড়ী তাহাকে যাইতে দেয় নাই।

যে লোক একবার কিছু আনিয়া দেয়, সে যদি প্রত্যহ আনিয়া দিতে না পারে তো মানুষের মন একটুখানি বিগড়াইবার কথাই। কুমুরও ঠিক তাহাই হইল। সুকুমারী সেই কবে একদিন বাবুদের বাড়ী মুড়ি ভাজিয়া এক ধামা মুড়ি আর দু'আনা পয়সা আনিয়াছিল, তাহার পর হইতে একেবারে চুপ করিয়া বসিয়া আছে, একটি পয়সাও সে রোজগার করিয়া আনে নাই।

আনিবার চেষ্টা সে যে না করিয়াছে তাহা নয়, কিন্তু কি করিবে, বেচারা কোথাও কিছুই জোগাড় করিতে পারে নাই।

অথচ কুমুর ধারণা অন্যরকম। কুমু ভাবিতেছে, পায়ের উপর পা দিয়া মানুষ যদি ছেলেপুলে লইয়া বসিয়া বসিয়া খাইতে পায় তো রোজগার সে করিবে কেন? সুতরাং

এইরকম নির্ব্বিবাদে তাহাদের দু'বেলা খাইতে দেওয়া তাহার অন্যায় হইতেছে।

সুকুমারীর কিন্তু সেই এক কথা, এক চিন্তা।—সই তাহার একবার আসিলে হয়! সই আসিলেই সব কষ্ট তাহার ঘুচিয়া যাইবে।

হয়তো যাইবে। কিন্তু সে কবে? বড়লোকের মেয়ে শ্বশুরবাড়ী গিয়াছে, কবে যে আসিবে তাহার কোনও ঠিক-ঠিকানা নাই।

বাড়ীর পাশেই খিড়কি-পুকুর। দুপুরে সেদিন সুকুমারী একা সেখানে স্নান করিতেছিল। এমন সময় ছোট মেয়েটা তাহার কছে গিয়া দাঁড়াইল।

সুকুমারী বলিল, 'তুই আবার এখানে এলি কেন শঙ্করী?'

ফুটফুটে ছোট্ট মেয়েটি, বাব্‌রি-কাটা কোঁকড়ানো কালো চুল কাঁধের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, মাথা নাড়িয়া, ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, 'মামীমা মেলে। এমনি করে' আমার চুল-গুলো ধরে' টেনে দিলে।'

সুকুমারী বলিল, 'তা দিক্ না মা! তাতে আর কি হয়েছে। কি—করেছিলি কি?'

শঙ্করীর বড়-বড় ঢলঢলে চোখ দুইটি তখন জলে ভরিয়া আসিয়াছে। বলিল, 'কিছুই করিনি মা। ভোলাদা খেতে বসেছিল, আমি সেইখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।'

সুকুমারী বলিল, 'না, তুমি আরও কিছু অন্যায় করেছিলে নিশ্চয়। শুধু শুধু কেউ মারে কখনও?'

শঙ্করী বলিল, 'না মা, কিছু করিনি, আমি সত্যি বলছি। সেই তুমি যেদিন থেকে বলেছো, সেইদিন থেকে মিছে কথা আমি বলি না, মা।'

কাপড়টা তাড়াতাড়ি কাচিয়া লইয়া সুকুমারী ঘাট হইতে উঠিল। উঠিয়া শঙ্করীর কাছে গিয়া চুপি চুপি বলিল, 'মামীমা যদি মারে তো একটুখানি সহ্য করিস্ মা, কি আর করবি বল্।'

এই বলিয়া তাহার কচি হাতের একটি আঙুল ধরিয়া বলিল, 'চল্, ভিজে কাপড়ে আর কোলে নিতে পারি না—চল্। দাঁড়া বাছা, আর ক'টা দিনই-বা আমরা এখানে থাকবো, তোর সই-মা একবার শ্বশুরবাড়ী থেকে এলে হয়। তারপর আমরা বাবুদের দালান-বাড়ীতে গিয়ে উঠবো।'

শঙ্করী তাহার কান্না ভুলিয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিল, 'সই-মা কোথায় গেছে মা?'

'শ্বশুরবাড়ী গেছে।'

'শ্বশুরবাড়ী কতদূর মা?'

'সে অনেক দূর। চুপ কর্। মামীমা শুনতে পেলে বকবে।'

'আমি কিন্তু হেঁটে হেঁটে যেতে পারি, মা। সেই যে—এখানে আসার দিন—'

শঙ্কর বোধকরি তাহাদেরই অপেক্ষা করিতেছিল। শঙ্করীর দিকে তাকাইয়া বলিল, 'তুই কিজন্যে গিয়েছিলি মা'র সঙ্গে ? ···খেতে দাও মা, বড্ডো ক্ষিদে পেয়েছে।'

সুকুমারী বলিল, 'ক্ষিদে পেয়েছে তো তোর ভোলাদার সঙ্গে বসতেই পারতিস্।'

বসিতে তাহারা দুই ভাই-বোনেই গিয়াছিল, কিন্তু কুমু তাহাদের তাড়াইয়া দিয়াছে।

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল, জবাব দিল কুমু নিজে। বলিল, 'ভোলা ইস্কুল থেকে এসেছিল ঠাকুরঝি, তাই ওকে চারটি তাড়াতাড়ি খাইয়ে দিলাম। ওরা তো আর ইস্কুলে যাবে না, তাই বললাম, দাঁড়া বাছা, তোর মা এসে খেতে দেবে তোদের, তাইতে তোমার ও ছেলেটি গেল গজগজ করে' এইদিকে চলে'—আর মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে গেল তোমাকে লাগাতে।'

সুকুমারী বলিল, 'না বৌদি, শঙ্করী কিছু বলেনি।'

অনুচ্চকণ্ঠে কুমু বলিল, 'হ্যাঁ, বলেনি আবার!'

সুকুমারী চুপ করিয়া রহিল।

আজ শুভদিন

*

*　　*

সেইদিন হইতে একটা ব্যবস্থা দেখা গেল, বদ্‌লাইয়া গেছে। কুমুর ছেলে ভোলানাথের সঙ্গে এতদিন ধরিয়া ইহাদেরও তুই ভাই-বোনকে খাইতে দেওয়া হইত, সেইদিন হইতে সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিতে লাগিল। শঙ্কর-শঙ্করীর আগেই ভোলানাথকে প্রত্যহ তুইবেলা লুকাইয়া খাইতে দেওয়া হয়, ইহাদের কেহ যদি সে সময় কাছে গিয়া দাঁড়ায় তো কুমু ঠিক কুকুর-বিড়ালের মত অপমান করিয়া সেখান হইতে তাহাদের তাড়াইয়া দেয়।

শঙ্কর বড় ছেলে, সবই বুঝিতে পারে। এবং বুঝিতে পারিয়া ভোলানাথ যখন খাইতে বসে, তখন হয় সে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যায়, আর নয় তো সে-রাস্তা মাড়ায় না। কিন্তু শঙ্করী ছেলেমানুষ, অত সব বুঝিতে না পারিয়া এক-একদিন মনের ভুলেই হয়তো ঠিক সেই সময়েই রান্নাঘরে গিয়া হাজির হয়, আর কুমুর হাতে মার খাইয়া ফিরিয়া আসে।

ভোলানাথের আহারাদি চুকিয়া গেলে সেদিন অমনি শঙ্কর ও শঙ্করী তু'জনে পাশাপাশি খাইতে বসিয়াছে। কুমু তাহাদের খাইতে দিয়া বাহিরে বোধকরি, হাত ধুইতে গিয়াছিল। শঙ্করী তাহার মায়ের মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, 'মা, আমি ডিমের বড়া নেবো।'

সুকুমারী বলিল, 'ডিমের বড়া কোথায় পাবি? খেয়ে নে, খেয়ে নে মা, আর জ্বালাস্‌নি।'

শঙ্করী ঝোঁক্ ধরিয়া বলিল, 'আমি দেখেছি, ভোলাদা যে খাচ্ছিলো। ওই ওইখানে আছে—ওই বাটি ঢাকা দেয়া। না মা, তুমি দাও আমাদের একটুখানি।'

শঙ্কর তাহাকে এক ধমক দিতেই দাদার ভয়ে সে চুপ করিল বটে, কিন্তু কুমু তখন হাত ধুইয়া রান্নাঘরে ফিরিতে-ছিল, শঙ্করীর আব্দার তাহার কানে গেল। হাতের ঘটিটা সে টিপ্ করিয়া মাটিতে নামাইয়া সুকুমারীকে বোধকরি শুনাইয়া শুনাইয়া বলিল, 'ভোলানাথ আজ কোত্থেকে একটা হাঁসের ডিম এনে বলে কিনা—আমায় ভেজে দাও মা, ডিম আমি বড্ডো ভালবাসি। একটি এই এতটুকু ডিম—ও-বেলায় খাবে বলে' এই একটুখানি রেখেছিলাম। তা থাক্, ওকে আর খেতে হবে না। বলিয়া বাটিটা উল্টাইয়া ভাজা ডিমের বড়াটি বাহির করিয়া তৎক্ষণাৎ সে ইহাদের দুই ভাই-বোনের পাতায় সবটুকু ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া হন্ হন্ করিয়া সেখান হইতে বাহির হইয়া গেল।

সুকুমারী 'হাঁ হাঁ' করিয়া নিষেধ করিতে যাইতেছিল, কিন্তু কুমু তাহার আগেই কাজ শেষ করিয়া দিয়া বাহির হইয়া গেছে।

শঙ্করীর মুখের পানে সুকুমারী কট্‌মট্ করিয়া একবার তাকাইল।

শঙ্কর বলিল, 'খেয়ে ওঠ্ আগে। মেরে তোকে খুন করে' দেবো।'

শঙ্করী কিন্তু বুঝিতে পারিল না—কি অপরাধ সে করিয়াছে। ডিমের বড়াটি হাতে লইয়া ফ্যাল্‌ফ্যাল করিয়া সে তাহার মা দাদার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

এবং সেইদিনই বৈকালে গ্রামের বাগদিপাড়ায় সুকুমারী নিজে গিয়া পরাণ বাগদির মেয়ের কাছ হইতে হাঁসের একটি ডিম চাহিয়া আনিয়া কুমুর পায়ের কাছে নামাইয়া দিয়া বলিল, 'ভোলানাথকে এইটি আজ তুমি ভেজে দিয়ো বৌদি।'

ব্যাপারটা কুমুর কেমন যেন ভাল লাগিল না। গম্ভীর মুখে একবার বলিল, 'হুঁ।'

বলিয়াই সে সুকুমারীর মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, 'এ না হয় সামান্যি একটা ডিম ঠাকুরঝি, কিন্তু তেজ তো তোমার কম নয় দেখছি।'

সুকুমারী বলিল, 'না বৌদি, এতে আর তেজের কি আছে?'

এই বলিয়া সে চলিয়া যাইতেছিল, কুমু তাহাকে ফিরিয়া ডাকিল—'শোনো ঠাকুরঝি?'

সুকুমারী কাছে আসিয়া দাঁড়াতেই কুমু বলিল, 'ফিরে দিতে হলে'—শুধু একটি ডিম না দিয়ে, আমার ধার তুমি কড়ায়-গণ্ডায় শোধ দিতে পারতে তবে বুঝতাম—হ্যাঁ, তোমার তেজের দাম আছে।'

সুকুমারী বুঝিল—কুমু রাগিয়াছে। কারণ এ-রকম কথা

সে তাহার মুখে কখনও শোনে নাই। বলিল, 'তোমার ধার কি আমি জীবনে কোনোদিন শোধ করতে পারবো বৌদি? তুমি আমার ওপর রাগ করেছো, নয়?'

কুমু বলিল, 'না, রাগ করিনি।'

বলিয়া সে আর সুকুমারীকে কোনও কথা বলিবার অবসর না দিয়াই সেখান হইতে উঠিয়া গেল।

*

* *

কিন্তু কুমুর মুখ যখন একবার খুলিয়াছে, তখন আর সহজে তাহা বন্ধ হইবার নয়। সুকুমারী সেদিন তাহাদের প্রতিবেশী চারুদের বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছিল। চারুর মা বলিল, 'হ্যাঁ লা সুকু, বাবুদের বাড়ী তোকে নাকি ভাত রাঁধতে ডাকছে—তবু তুই যাচ্ছিস্ না কেন বল দেখি?'

সুকুমারী যেন আকাশ হইতে পড়িল। 'কই, আমাকে তো কেউ ডাকেনি পিসি!'

—'ও মা, সে কি কথা লো! কুমু সেদিন নিজে বললে যে!'

—'বৌদি আর কি বললে পিসি?'

চারুর মা বলিল, 'আরও কি-সব বললে যেন বাছা,—আমার ঠিক মনে পড়ছে না।'

—'মনে করে' একটুখানি ছাখো না পিসি!'

পিসি বলিল, 'মাছ ডিম—মাছ ডিম বলে' আরও কি সব যেন বলছিল, আমি ততটা আর কান দিলাম না বাছা।'

সুকুমারী বুঝিল—কুমুর মতলব ভাল নয়। সে আর মুহূর্ত্তমাত্র সেখানে অপেক্ষা না করিয়া বাবুদের বাড়ী—সই-মার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল, 'সইয়ের চিঠি-পত্তর কিছু পেয়েছো সই-মা?'

সই-মা বলিল, 'হ্যাঁ বাছা, পেয়েছি। আসবে। এই মাসেরই শেষ-নাগাদ সে আসবে এখানে।'

অকূল সমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে এতটুকু নিরাপদ আশ্রয়ের চিহ্ন দেখিলেও মানুষ যেমন আশায় বুক বাঁধিয়া আনন্দে উল্লসিত হইয়া ওঠে, সুকুমারীর অবস্থাও ঠিক তেমনি হইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল, 'আমার কথা কিছু লিখেছে সই-মা?'

সই-মা বলিল, 'না বাছা, তোর কথা লিখতে আমি নিজেই ভুলে গিয়েছিলাম। তুই যে এখানে এসেছিস্ তা সে হয়তো জানে না।'

এমনি করিয়া এ-কথা সে-কথা কহিতে কহিতে, সন্ধ্যা প্রায় উত্তীর্ণ হইয়া গেল। সুকুমারী ফিরিল, দেখিল, কুমু তখন উঠানটা ঝাঁট দিয়া, ঘরদোর পরিষ্কার করিয়া সন্ধ্যা জ্বালাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে।

সুকুমারীকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়াই বলিয়া উঠিল, 'কোথায় গিয়েছিলে গো রাণী?'

সুকুমারী বলিল, 'যাইনি কোথাও। ...খাবার জল কি তুমি এনেছো বৌদি?'

সুকুমারীই প্রত্যহ বৈকালে পুকুরের ঘাট হইতে এক কলসী খাবার জল লইয়া আসে। সেদিন সে জলের কথা ভুলিয়াই গিয়াছিল।

কুমু ঘাড় নাড়িয়া শুধু বলিল, 'হুঁ।'

অথচ রাত্রে শঙ্কর শঙ্করী খাইতে বসিয়া জল চাহিতেই সুকুমারী জল গড়াইতে গিয়া দেখে—কলসী ফাঁকা, এক ফোঁটা জলও তাহাতে নাই।—'হ্যাঁ বৌদি, জল এনে কি তুমি আর-কোথাও ঢেলে রেখেছো?'

কুমু বলিল, 'এ কি-রকম কথা তোমার ঠাকুরঝি? জল আমি কোনোদিন আনি, যে আজ আনবো! তা বেশ, আজ থেকে বুঝলাম—এক কলসী জল এনে তুমি আমার উপগার করতে, আজ থেকে তাও আর করবে না। কাল থেকে আনবো এক কলসী করে'।

সুকুমারীর বুকের ভিতরটা কেমন যেন করিতে লাগিল। আজ তাহারই অন্যায় হইয়াছে।—ছি-ছি, সই-মার কাছে এত দেরি করা তাহার উচিত হয় নাই। সই-এর কথা উঠিলে সে যে আর সেখান হইতে উঠিতেই চায় না।

ওদিকে শঙ্করী তখন জল জল করিয়া চীৎকার করিতেছে।

শঙ্কর বুঝিতে পারিয়া, জল না খাইয়াই উঠিয়া গেল।

সুকুমারী মেয়েটার কাছে আসিয়া বলিল, 'জল না হলে'

গলায় ভাত কি তোর পোরাচ্ছে না হতভাগী? খা-না তাড়াতাড়ি, খেয়ে ওঠ্, জল আমি এনে দিচ্ছি।'

শঙ্করী তখন ঝালে, উ-হু করিতে করিতে কাঁদিয়া ফেলিল, 'মরে গেলাম যে! বাবা রে বাবা। তরকারিটা কেমন ঝাল, তুমি একবার খেয়ে ছাখো না!'

দূরে দাঁড়াইয়া কুমু সবই শুনিতেছিল। বলিল, 'বাড়ীতে জল নেই কিনা, তাই তোর তরকারিটা আমি ইচ্ছে করেই ঝাল দিয়ে বিষ করে' দিয়েছি, না কি রে শঙ্করী?'

সুকুমারীর তখন কি যে হইল কে জানে, মেয়েটার পিঠে টিপ্ করিয়া সজোরে এক চড় মারিয়া বলিল, 'খেতে তোকে আর হবে না হতভাগী, ওঠ্।'

মার খাইয়া শঙ্করী কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া পড়িল।

সুকুমারীকে একটুখানি আড়ালে পাইয়া শঙ্কর বলিল, 'শুধু শুধু ওকে মারলে কেন মা?'

সুকুমারী বলিল, 'না বাবা, ও আমায় ভারি বিরক্ত করে। দেখলি-না, জলের জন্যে কিরকম করলে!'

শঙ্কর তাহার ঠোঁটের ফাঁকে ঈষৎ হাসিল। হাসিয়া বলিল, 'শুধু শুধু করেনি মা, ওর দোষ নেই। আমাদের পাতের তরকারিটা তুমি একবার মুখে দিয়ে দেখো।'

ছোট ছেলে-মেয়েদের লইয়া এত-বড় শয়তানী যে কুমু করিতে পারে, সে ধারণা সুকুমারীর ছিল না এবং ইহাই

যদি সত্য হয় তো হে ভগবান, তাহা হইলে আমাদের আর স্থান কোথায়?

সুকুমারীর ছেলে-মেয়ের এঁটো বাসন সুকুমারীই মুক্ত করে। এমন কি সুকুমারী এখানে আসিবার পর হইতে এঁটো একটি বাটি পর্য্যন্ত কুমুকে কোনোদিন হাত দিয়া স্পর্শও করিতে হয় না। কিন্তু সেদিন সুকুমারী দেখিল—অবাক্ কাণ্ড! মেয়েটা মার খাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া গিয়াছিল বলিয়া, সুকুমারীকেও তাহার পিছু পিছু ছুটিতে হইয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া এঁটো পরিষ্কার করিতে গিয়া দেখে—শঙ্কর ও শঙ্করীর থালা-বাটি কুমু নিজের হাতে পরিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে, এতটুকু উচ্ছিষ্ট ভাত-তরকারি পর্য্যন্ত ফেলিয়া রাখে নাই।

কুমু বলিল, 'মেয়েটার পিছু পিছু ছুটলে, ভাবলাম, কখন ফির্‌বে তার ঠিক নেই, তাই এঁটোকাঁটা আমি নিজেই পরিষ্কার করে' দিলাম ঠাকুরঝি। নাও, বোসো, অনেক বেলা হয়ে গেছে।'

শঙ্করের কথাটা সুকুমারী এতক্ষণে বিশ্বাস করিল।

কিন্তু তাহার পরের দিন ঘটিল আবার আর-একটা ভারি মজার ব্যাপার। অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়াই কুমু বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, সংসারের বাসিপাট্ শেষ করিয়া উনান ধরাইবার জন্য সুকুমারী তখন কয়লা ভাঙিতে বসিয়াছে। কুমু বলিল,

'থাক্ ঠাকুরঝি, উনুন আজ আর ধরিয়ো না। সকালেই একটা নেমন্তন্ন পাওয়া গেল। ফকিরের মা বললে—আজ তোমরা দু'মা-ব্যাটায় আমার এইখানেই খেয়ো।'

এই বলিয়াই সে গম্ভীর মুখে সেখান হইতে সরিয়া পড়িল।

কিন্তু তাহারা দুই মা-ব্যাটায় না-হয় পরের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইবে, আর সুকুমারী?—সুকুমারীর ছেলে আর মেয়ে? উনান না ধরাইলে, তাহারা খাইবে কি? অথচ সে সম্বন্ধে কুমু একটা কথাও বলিল না।

কয়লা ভাঙা বন্ধ করিয়া সুকুমারী উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর খিড়কীর পুকুরে মুখ-হাত ধুইয়া, কাপড় কাচিয়া বাড়ী হইতে সেও বাহির হইয়া গেল।

সুকুমারীর যাইবার একমাত্র স্থান—বাবুদের বাড়ী, তাহার সই-মার কাছে। নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, সেইখানেই সে গিয়া দাঁড়াইল। বাবুদের দেবোত্তর রাধামাধবজীর মন্দিরে প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে পাঁচটি করিয়া অতিথি সেবার নিয়ম। কিন্তু এই দূরদূরান্তের গ্রামে পাঁচজন অভ্যাগত অতিথি সবদিন পাওয়া যায় না, তাই সেবাইত-ঠাকুরের যখন যাহাকে ইচ্ছা—পাড়া-প্রতিবেশীদের ভিতর হইতে বাছিয়া লইয়া খাইতে বসায় এবং ঠাকুরবাড়ীর খাতায় তাহাদেরই নাম লিখাইয়া দিয়া কর্ত্তব্য সমাপন করে।

সুকুমারী তাহা জানে, আর জানে বলিয়াই বাবুদের এই

ঠাকুরবাড়ীতে শঙ্কর-শঙ্করীর জন্য নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে সুকুমারীকে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না।

ঠাকুরবাড়ীতে খাইতে গিয়া শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কোথায় খাবে, মা ?'

সুকুমারী তাহাকে এক ধমক্ দিয়া বলিল, 'তোকে তার জন্যে ভাবতে হবে না হতভাগা, তুই চুপ কর্!'

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল, শঙ্কর ও শঙ্করীর উচ্ছিষ্ট পাতায় ভাত-ডাল-তরকারি যাহা পড়িয়া রহিল, সুকুমারী তাহাই মুখে দিয়া পাতা দুইটা পরিষ্কার করিয়া উঠিয়া আসিল।

কুমু বলিল, 'ঠাকুরবাড়ীতে খেতে গিয়ে, আমার খুব নিন্দে করে' এলে তো ঠাকুরঝি ?'

সুকুমারী মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার নামে মিথ্যা এই অপবাদ কুমু যে কেন দিতেছে কে জানে! তাহার কাছে এমন কি অপরাধ সে করিয়াছে! কথাটার জবাব দিতে গিয়া সুকুমারীর ঠোঁট দুইটি থর্থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, অভিমানিনী মেয়ের মত চোখ দুইটা তাহার জলে ভরিয়া আসিল। শেষে অতি কষ্টে বলিল, 'আমার ওপর রাগ তুমি কেন করলে বৌদি ? আমি কি করেছি ?'

কুমু বলিল, 'রাগ কেন করবো ? রাগ করতে আমার ব'য়ে গেছে।'

*

* *

রাত্রে খাইবার বন্দোবস্ত ঠাকুরবাড়ীতে নাই। সুকুমারী নিজে না-হয় উপবাস করিয়া কাটাইতে পারে, শঙ্কর-শঙ্করী কি যে করিবে কে জানে! সই-মার কাছে কুমুর কথা কিছু বলিবার উপায় নাই। দৈবাৎ যদি সে-কথাটা আবার কুমুর কানে গিয়া ওঠে তো মাথা গুঁজিবার ঠাঁইটুকুও তাহার আর থাকিবে না। সুতরাং যা-হয় হোক্, মনে করিয়া সন্ধ্যা হইতেই সুকুমারী হাল ছাড়িয়া দিয়া ঘরের মেঝের উপর চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল।

কুমু তাহার ছেলেটিকে খাওয়াইয়া নিজে খাইয়া যখন দেখিল, সুকুমারী তাহার ছেলে-মেয়ে লইয়া উপবাস করিয়া পড়িয়া আছে তখন আর কি করিবে, বাধ্য হইয়া আপন-মনে সে এই বলিয়া গজগজ করিতে লাগিল যে, গৃহস্থের বাড়ী মানুষ যদি উপবাস করিয়া পড়িয়া থাকে তো অমঙ্গল হওয়া স্বাভাবিক এবং সেই অমঙ্গলকে টানিয়া আনিবার জন্যই ইচ্ছা করিয়া মেয়েটা তাহার ছেলে-মেয়ে লইয়া দাঁত-কামড়াইয়া পড়িয়া আছে।

এই বলিয়া, হঠাৎ একসময় কুমু তাহার কাছে আসিয়া ডাকিল, 'ওঠো ঠাকুরঝি, ওঠো। ভাত তো রাঁধিনি, তোমরা সবাই মিলে মুড়িই চারটি করে' খাও। একবেলার ব্যবস্থা

তো ঠাকুরবাড়ীতেই হয়েছে, আর-একবেলা না-হয় তোমার সই না-আসা পর্য্যন্ত মুড়ি চারটি করে' আমি দেবো। নাও ওঠো।'

দারিদ্র্য যাহাদের নিত্য সঙ্গী, মান-অভিমান তাহাদের সাজে না। সুকুমারী উঠিয়া বসিল। উঠিয়া বসিল নিজের জন্য নয়; যে দু'টা ছেলে-মেয়েকে সে পেটে ধরিয়াছে, যে দু'টার জন্য তাহার বাঁচিয়া থাকা, যাহারা তাহার পরম শত্রু, সেই তাহাদেরই জন্য।

কিন্তু শঙ্কর কিছুতেই খাইতে চাহিল না। বলিল, 'আমার ক্ষিদে নেই মা।'

—'ক্ষিদে নেই কিরে? সেই কখন্ চারটি খেয়েছিস্। নে বাবা—ওঠ্, আর জ্বালাস্নি।'

শেষ পর্য্যন্ত শঙ্কর কিছুতেই উঠিল না।

গভীর রাত্রে—সকলেই যখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, শঙ্কর ডাকিল, 'মা!'

সুকুমারীর চোখে ঘুম নাই। বলিল, 'কি?'

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল।

—'কি রে, কি বলছিস্?'

শঙ্কর বলিল, 'চলো মা, এখান থেকে আমরা চলে' যাই।'

সুকুমারী বলিল, 'কোথায় যাবো বাবা? আমাদের সব জায়গাই তো সমান।'

—'না মা, এর চেয়ে বরং আদমপুরেই ফিরে চলো।'

—'সেখানে কে আছে আমাদের ?'

—এখানেই-বা কে আছে—শুনি ? চলো, আমি তোমাদের ভিক্ষে করে' খাওয়াবো।'

এই ভিক্ষার নামে সুকুমারী চটিয়া উঠিল। বলিল, 'ওরে, থাম্, ভিক্ষের কথা বলিস্‌নি বাবা! ভিখিরীর ছেলে কিনা, তাই রক্তের মধ্যে তোর বোধ হয় মাঝে-মাঝে ভিক্ষের সাধ জেগে ওঠে। না রে ?'

শঙ্কর বলিল, 'না মা, তা নয়। এখানে এই এমনি করে' আর কিছুদিন থাকলে আমরা সবাই মরে যাবো।'

সুকুমারী বলিল, 'আর ক'টা দিন চোখ বুজে কোনো রকমে কেটে যাক্, ব্যস। তারপর সই এলে আর কাউকে কিছু ভাবতে হবে না, দেখে নিস্।'

এবং এই প্রসঙ্গে তাহার সইএর কথা উঠিয়া পড়িতেই সুকুমারী কিছুতেই আর থামিতে পারিল না। সই তাহার কত-বড় সুহৃদ, কত-বড় মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিনী এবং কত ভালমানুষ ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া নানান্ উদাহরণ দিয়া শঙ্করকে সে তাহাই বুঝাইতে লাগিল।

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তু-একদিনের মধ্যেই সুরবালা আসিয়া পৌঁছিবে।

প্রসাদের অপেক্ষায় সুকুমারী সেদিন তাহার ছেলে-মেয়ে তু'টিকে লইয়া ঠাকুরবাড়ীর চত্বরে দাঁড়াইয়া ছিল, পুরোহিত-ঠাকুর ধীরে-ধীরে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'সুকুমারী, তোমায় একটি কথা বলবো মা, তুঃখু কোরো না।'

মাথা হেঁট করিয়া সুকুমারী বলিল, 'বলুন।'

পুরোহিত বলিল, 'তোমার ছেলে-তু'টির খাওয়া এখানে আজ নিয়ে তিনদিন হলো মা, সরকারমশাই আজ সকালে সেই কথাই বলছিলেন।'

সুকুমারী অতি কষ্টে উচ্চারণ করিল, 'সই না আসা পর্য্যন্ত—'

কথাটা সে আর শেষ করিতে পারিল না।

পুরোহিত বলিল, 'আমার যতদূর সাধ্য আমি সরকার-মশাইকে বলেছি মা, আবার বলবো। কিন্তু তোমার সই এলেই তুমি যেন তার কাছ থেকে একটা হুকুম নিয়ে—'

ঘাড় নাড়িয়া সুকুমারী বলিল, 'সে আপনাকে বলতে হবে না। আমি বলবামাত্র দেখবেন, সই আপনাদের তক্ষুনি বলে' দেবে।'

পুরোহিত বলিল, 'সেই কথাই বলছিলাম মা, নইলে আমাদের ঘাড়ে দোষ পড়বে।'

কিন্তু তাহার পরদিন একটা অঘটন ঘটিয়া গেল।

শঙ্কর-শঙ্করীকে লইয়া সুকুমারী সেদিন আসিয়া ঠাকুর-বাড়ীর চত্বরে পাতা পাতিয়া বসিয়াছে, এমন সময় সরকার-মশাই আসিয়া দাঁড়াইলেন।

ডাকিলেন, 'ঘোষালমশাই!'

পুরোহিত হাতজোড় করিয়া তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

সরকার বলিলেন, 'কাল না আপনাকে বারণ করে' দিয়েছিলাম! আপনি বুঝি ওদের কিছু বলেননি?'

ঘাড় নাড়িয়া পুরোহিত বলিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, বলেছিলাম।'

—'তা সত্ত্বেও আজ আবার এসেছে?'

—'আজ্ঞে ওরা বড় গরীব, বড় দুঃখী।'

সরকার বলিলেন, 'গরীব-দুঃখী এমন তো অনেক আছে ঘোষালমশাই, কিন্তু আমার যে হুকুম নেই। ওগো—ও মেয়েটি, ছেলে নিয়ে আজ তোমায় উঠতে হবে। তিনদিনের জায়গায় চার-পাঁচদিন হয়ে গেছে, আর না।'

কথাটা শুনিয়াই পাতা ফেলিয়া দিয়া শঙ্কর ছুটিয়া পলায়ন করিল। বাকি রহিল মাত্র সুকুমারী ও শঙ্করী।

লজ্জায় সুকুমারী উঠিতে পারিতেছিল না।

ছোট মেয়েটাকে দেখিয়া সরকারমশাইএর দয়া হইল কিনা কে জানে, বলিলেন, 'আচ্ছা, আজকের মতন দিন ঠাকুরমশাই। কিন্তু আজই শেষ—মনে থাকে যেন।'

শঙ্কর তো পালাইয়াছে, শঙ্করীকে কোনোরকমে খাওয়াইয়া দিয়া সুকুমারী সেদিন আর নিজে কিছুতেই খাইতে পারিল না। মেয়েটার হাত ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই শোনা গেল, ওদিকের বাড়ীতে খুব একটা হৈ-চৈ গোলমাল হইতেছে।

কে যেন আসিয়া সংবাদ দিল—শ্বশুরবাড়ী হইতে সুরবালা আসিয়াছে।

তাড়াতাড়ি হাত ধুইয়া মেয়েটাকে কোলে লইয়া সুকুমারী তখনি বাবুদের ভিতর-বাড়ীতে গিয়া হাজির হইল।

সত্যই সুরবালা আসিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গে সোনার গহনা, পরনে ঝলমলে জরিদার শাড়ী, পরম সৌভাগ্যবতী রাজেন্দ্রাণী সুরবালা। সুরবালা, সুকুমারীর বাল্যসহচরী, সুকুমারীর সই!···

সুকুমারী তাহার পরনের কাপড়খানা টানিয়া টানিয়া ঠিক করিয়া লইল, তাহার পর শঙ্করীকে সঙ্গে লইয়া হাসিতে হাসিতে সুরবালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

সুরবালার ঝি তাহার পাশে পাশে চলিয়াছে, মা চলিয়াছে আগে আগে, সুরবালা তাহার দোতলার ঘরে যাইতেছিল।

সুকুমারী ডাকিল, 'সই!'

কিন্তু ডাকটা তাহার গলা দিয়া এত আস্তে বাহির হইল

যে, সে নিজে ছাড়া সে ডাক আর কেহ শুনিতে পাইল কিনা কে জানে।

সিঁড়ি বাহিয়া সকলেই উপরে উঠিল। সুকুমারী সকলের পিছনে।

এইবার সে তাড়াতাড়ি একটুখানি আগাইয়া গিয়া আবার ডাকিল, 'সই!'

সুরবালা একবার পিছন ফিরিয়া তাকাইল। সুকুমারীর সঙ্গে চোখোচোখি হইতেই সুকুমারী নিজেই একটুখানি জোর করিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'এলে?'

নিতান্ত যেন না বলিলে নয়, এমনিভাবে গম্ভীর-মুখে সুরবালা বলিল, 'হুঁ।'

এবং 'হুঁ' বলিয়াই সুরবালা তাহার ঝি'র মুখের পানে একবার তাকাইল।

সে চাহনির অর্থ আর-কেহ না বুঝিলেও—ঝি বুঝিল।

তখনি সে পিছন ফিরিয়া সুকুমারীর মুখের পানে তাকাইয়া রীতিমত রুক্ষকণ্ঠে কহিল, 'তুমি কিজন্যে আসছো মা পিছু-পিছু? মানুষটা এইমাত্তর নামলো গাড়ী থেকে, আক্কেল-বুদ্ধি তোমাদের কি কিছু নেই মা? ছি!'

সুকুমারী লজ্জায় যেন মরিয়া গেল। ঝি তাহাকে চেনে না, গ্রামের একটা যে-সে লোক ভাবিয়া কথাগুলা তাহাকে সে বলিয়াছে নিশ্চয়ই।

কিন্তু কই, সইও তো তাহাকে ইহার জন্য তিরস্কার করিল না ?

সুরবালা পাশের একটা ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মা ঢুকিল, ঝি ঢুকিল এবং সুকুমারীর মুখের উপরেই ঘরের দরজাটা তাহারা সশব্দে বন্ধ করিয়া দিল।

সুকুমারী তখন সেখান হইতে যেন পালাইতে পারিলে বাঁচে—এমনি তাহার মনের অবস্থা। চোখ-দুটা জলে ভরিয়া আসিয়াছে। পায়ের নীচে পৃথিবীটা যেন ঘুরিতেছে…

শঙ্করীর হাত ধরিয়া সে পিছন ফিরিল। এক-পা এক-পা করিয়া যখন সে সিঁড়ি ধরিয়া নীচে নামিতেছে, শঙ্করী জিজ্ঞাসা করিল, 'হ্যাঁ মা, সই-মা যে কথা বললে না তোমার সঙ্গে ?'

সুকুমারী অন্যমনস্ক হইয়া কি যেন ভাবিতেছিল, বলিল, 'হুঁ।'

তাহার পরেই আবার কি ভাবিয়া জবাব দিল, 'কেন কথা বলবে না, বললে তো।—আর এই রোদ্দুরে এতখানি পথ…দেখলিনি—মুখখানা কেমন লাল হয়ে গেছে।'

তাহার পর আবার বলিল, 'আর ওই ঝি-হতভাগী ওর শ্বশুরবাড়ীর লোক, আমায় চেনে না।'

আজ শুভদিন

*

* *

সুরবালা তাহার আবাল্যের সহচরী—তাহার পাতানো সই। দু-জনের মধ্যে এত ভালবাসা জন্মিয়াছিল যে, পাড়ার লোক, ঘরের লোক এই লইয়া একদিন কত কথাই-না কহিয়াছে। তাহাদের এই ঘনিষ্ঠতার বন্ধন যে কোনোদিন ছিঁড়িয়া যাইতে পারে, সেকথা ভুলিয়াও কেহ ভাবিতে পারে নাই। আজ এই এতদিন পরে তাহার সেই সই-এর কাছ হইতে এই দুর্ব্যবহার পাইয়া সুকুমারী হঠাৎ কেমন যেন—ঠিক পাগলের মত হইয়া গেল।

তা, পাগলের মত হইয়া যাওয়া বিচিত্র কিছু নয়। নিজের মনটাকে প্রথমে সে অনেক রকম করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিল। বুঝাইল—এই দারুণ গ্রীষ্মের রৌদ্রে বড়লোকের মেয়ে, বড়লোকের বৌ সে, এতটা পথ ঘোড়ার গাড়ীতে আসিয়াছে, হয়তো ক্লান্ত হইয়া গিয়া এখন সে বিশ্রাম করিতে চায়, কাহারও সঙ্গে কথা কহিতে এখন হয়তো তাহার ভাল লাগিতেছে না। আর ওই ঝি'টা যাহা বলিল, সে-সব তো ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। একে তো সে তাহাকে জীবনে কখনও দেখে নাই, তাহাদের সম্বন্ধের কথা কিছুই সে জানে না, তাহার উপর দাসী চাকরাণী ছোটলোকের মেয়ে, কাহার সঙ্গে কেমন করিয়া কথা বলিতে হয়, সে-শিক্ষা জীবনে সে কখনই

পায় নাই। আবার এমনও হইতে পারে—সুরবালা তাহাকে চিনিতে পারে নাই।

নিজেকে সে এমনি করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিল সত্য, কিন্তু মন তাহার কিছুতেই বুঝিতে চাহিল না। কোথায় যে তাহার কি দারুণ আঘাত লাগিয়াছে কে জানে! বুকের ভিতরটা ক্ষণে ক্ষণে মোচড় দিয়া দিয়া হু-হু করিয়া ওঠে, আর চোখ দুইটা তাহার কানায় কানায় জলে ভরিয়া আসে।

কিন্তু বিবাহের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত দুঃখ-দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম সুকুমারীকে বড় কম করিতে হয় নাই। এবং এই সংগ্রাম করিতে গিয়া জীবনে তাহার আর-কোনও অভিজ্ঞতা লাভ হোক্ আর নাই হোক্, এটুকু সে খাঁটি জানিয়াছে যে, যাহারা অর্থ-সম্পত্তিশালী, যাহারা ধনবান, তাহার মত দীন-দুঃখীদের তাহারা একটুখানি ঘৃণার চোখেই দেখিয়া থাকে। অভাবের বেদনা যে কতখানি তীব্র, সে-বোধ তাহাদের না থাকাই স্বাভাবিক। সুতরাং তাহার বাল্যসখী সুরবালা আজ যদি তাহাকে চিনিতে না পারিয়া থাকে তো অন্যায় কিছু করে নাই। সুরবালার কাছে এতখানি আশা করা বরং তাহারই অন্যায় হইয়াছে।

এ-সব কথা সুকুমারী যে বোঝে না তাহা নয়, ধনী এবং দরিদ্রে পার্থক্য যে কতখানি, তাহাও সে বেশ ভাল করিয়াই জানে। এবং এত-সব জানিয়া-শুনিয়াও সুরবালার ভরসা

সে যে কেন করিয়াছিল ইহাই আশ্চর্য্য।...এতক্ষণ পরে সুকুমারী পথে দাঁড়াইয়া শুধু এই কথাটাই ভাবিতে লাগিল।

তৃষ্ণার্ত্ত পথিক মরুভূমির মাঝখানে মরীচিকাকে অনেক সময় মরীচিকা জানিয়াও যেমন জল ভাবিয়া তাহারই দিকে প্রাণপণে ছুটিতে থাকে, ইহাও যেন ঠিক তেমনি। একে একে সব আশা-ভরসাই যখন তাহার নির্ম্মূল হইয়া গেল, ঘন ঘোর অন্ধকারের মাঝখানে এতটুকু আলোক-শিখার মত এই একটিমাত্র আশাই ছিল তাহার একমাত্র সম্বল। তাই সে ইহাকে এমন করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল।

আজ আবার তাহাও গেল।

পল্লীগ্রামের বেলা দ্বিপ্রহর। প্রচণ্ড রৌদ্র চারিদিকে ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছে। পথের মাঝখানেও আর এমন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকা চলে না। শঙ্কর সেই যে ছুটিয়া পালাইয়াছে, এখনও তাহার দেখা নাই। কোথায় যে গিয়াছে কে জানে! শঙ্করী তাহার কাছেই দাঁড়াইয়া। এইটুকু মেয়ে, পেটে এখনও তাহার ভাত পড়ে নাই, মুখখানি শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেছে। গরীবের মেয়ে, দুঃখের ব্যাপারটা একটুখানি তাড়াতাড়ি বুঝিতে পারে। অবস্থাটা হয়তো সেও বুঝিতে পারিয়াছে, তাই সে তখন হইতে আর একটি কথাও বলে নাই, নীরবে শুধু ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ করিয়া মায়ের মুখের পানে এক-একবার তাকাইতেছে মাত্র।

দুঃখের দিন তাহার জীবনে আজ নূতন আসে নাই, কিন্তু

যেমন করিয়াই হোক্ দু'বেলা পেটের আহার তাহাদের জুটিয়াছে। আজিকার মত এমন করিয়া অপমানিতও তাহাকে কোনোদিন হইতে হয় নাই, সকাল হইতে এমন করিয়া নিরম্বু উপবাসও দেয় নাই।

নিজে সে অবশ্য অনায়াসেই উপবাস দিতে পারে, কষ্ট শুধু তাহার এই শ্বশুর-শ্বশুরীর জন্য। কি ব্যবস্থা সে যে আজ তাহাদের জন্য করিবে, কেমন করিয়া মুখে তাহাদের আজ সে দু'টি অন্ন তুলিয়া দিবে—সেই ভাবনাই সুকুমারীকে পাইয়া বসিল। শেষ পর্য্যন্ত দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাই তাহাকে করিতে হইবে কিনা তাই-বা কে জানে।

কিন্তু দুনিয়ার নিয়মই এই যে, একটি একটি করিয়া সকল দুয়ারই মানুষের যখন বন্ধ হইয়া যায়, ভগবান তখন আপনা হইতেই এমন একটি দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেন যাহা একেবারে অপ্রত্যাশিত।

সুকুমারীরও ঠিক তাহাই হইল।

রাস্তার উপর বাবুদের প্রকাণ্ড অট্টালিকার যে ছায়া পড়িয়াছিল, সুকুমারী তাহার মেয়েটিকে লইয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়াছিল, এমন সময় ও-পাড়ার হারু তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'ওগো, তোমাকে ডাক্‌লে একবার আমার বৌদিদি।'

কথাটা সুকুমারী প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারিল না। মুখ তুলিয়া বলিল, 'কাকে ডাকছে? আমাকে?'

হারু বলিল, 'হ্যাঁ গো, তোমাকে।'

—'কেন বলো দেখি?'

হারু বলিল, 'তা আমি জানি না, তুমি এসো। শঙ্কর কোথা গেল?'

সুকুমারী বলিল, 'কি জানি ভাই, সেই যে ঠাকুরবাড়ী থেকে ছুটে পালালো, তারপর আর দেখিনি।'

হারু বলিল, 'দেখবো নাকি একবার?'

—'হ্যাঁ ভাই, ছাখো একবার, বাড়ীতেই গেছে বোধ হয়।'

হারু চলিয়া যাইতেছিল, সুকুমারী বলিল, 'চলো, আমিও যাই।'

বলিয়া সেও তাহার পিছু ধরিল।

কিন্তু অবাক কাণ্ড, শঙ্কর বাড়ীতে নাই। কুমু বলিল, 'কই, সে তো এখানে আসেনি ঠাকুরঝি।'

—'তাহ'লে সে গেল কোথায়?'

হারু বলিল, 'শঙ্করীকে নিয়ে তুমি চলো তো আমাদের বাড়ী, তারপর আমি দেখছি, শঙ্কর কোথায় গেল।'

দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে পথের ধূলা তখন এত গরম হইয়া উঠিয়াছে যে, শঙ্করী কিছুতেই হাঁটিতে পারিতেছিল না। কচি কচি পা-ছুইটি তাহার তপ্ত ধুলা-বালিতে পুড়িয়া যাইতেছিল। সুকুমারী তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল।

আজ শুভদিন

*

*   *

হারুদের বাড়ী বেশী দূরে নয়। হারুর দাদা নারায়ণ দরজায় দাঁড়াইয়া ছিল, সুকুমারীকে দেখিয়াই বলিল, 'আয়।'

'আয়' বলিয়াই সে বোধকরি তাহার স্ত্রীর উদ্দেশে সেইখান হইতেই চীৎকার করিয়া বলিল, 'ওগো, সুকুমারী এসেছে।'

বাড়ীতে তাহাদের লোকজন একরকম নাই বলিলেই হয়। নারায়ণ, নারায়ণের স্ত্রী ইন্দু, আর তাহার ছোট ভাই হারু।

ডাক শুনিয়া ইন্দু ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল। সুকুমারীর মুখের পানে তাকাইয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'এসো ভাই, এসো।'

সুকুমারী তাহার পিছু-পিছু ঘরের ভিতর গিয়া দাঁড়াইল। কোল হইতে শঙ্করীকে নামাইয়া বলিল, 'কি জন্যে ডেকে-ছিলে বৌ?'

ইন্দু কেমন যেন একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া একটা ঢোক গিলিয়া একবার ওদিক-ওদিক তাকাইয়া বলিল, 'বেরতো করেছিলাম ভাই। একটি মেয়েকে খাওয়াবার কথা ছিল। ঠাকুরপোকে বলেছিলাম তোমায় ডাকতে। সেই কোন্ সকালে ডাকবার কথা, তা সে ভুলেই গিয়েছিল।'

খাওয়ার কথা শুনিয়া সুকুমারীর চোখ-দুইটা হঠাৎ জলে

ভরিয়া আসিল। ভগবানের দয়া হইতে এখনও তাহা হইলে সে বঞ্চিত হয় নাই। মাথার ভিতরটা তাহার কেমন যেন করিয়া উঠিতেই ঘরের একটা দরজার পাশে সে বসিয়া পড়িল।

ইন্দু বলিল, 'বড় দেরী হয়ে গেল ভাই, বোসো, আসছি।' বলিয়া সে সেখান হইতে বোধকরি রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

সুকুমারী সেই অবসরে আঁচল দিয়া তাহার চোখের জল মুছিয়া শঙ্করীকে কাছে ডাকিয়া বলিল, 'বোস্ এইখানে।'

শঙ্করী চুপি-চুপি জিজ্ঞাসা করিল, 'দাদা খাবে না, মা?'

সুকুমারী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হুঁ, খাবে।'

এমন সময় ইন্দু আবার ঘরে ঢুকিল। বলিল, 'ছেলে কোথায় ঠাকুরঝি? অনেক বেলা হয়ে গেছে, ওদের আগে খাইয়ে দিলে হতো না?'

সুকুমারী বলিল, 'কি জানি ভাই, পাজি ছেলে কোথায় যে গেল, হারু তাকে খুঁজতে বেরিয়েছে। আসুক্, ততক্ষণ তুমি একে দাওগে। ...শঙ্করী, যা মা, তোর মামীমার সঙ্গে।'

ইন্দুর কাছে শঙ্করীর বোধকরি লজ্জা করিতেছিল, সুকুমারীকেও বাধ্য হইয়া উঠিতে হইল।

রান্নাঘরের একপাশে শঙ্করীকে খাইতে দেওয়া হইয়াছে। সুকুমারী তাহাকে বসিয়া বসিয়া খাওয়াইতেছে। এমন সময়

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িতেই সুকুমারী একবার ইন্দুর মুখের পানে তাকাইল। বলিল, 'আচ্ছা বৌ, ব্রত করে' লোকে সধবাই খাওয়ায়, তোমার আবার এ কি রকম খাওয়ানো ভাই?'

কথাটার জবাব ইন্দু ভাল করিয়া দিতে পারিল না। বলিল, 'অত-সব জানি না ভাই, সে তোমার ওই দাদা জানে, ওকে জিজ্ঞেস করোগে।'

ইহার অর্থ সুকুমারী ভাল বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিল।

কিন্তু অর্থ বুঝিতে বিশেষ দেরীও হইল না।

শঙ্করীর খাওয়া শেষ হইতেই ইন্দু বলিল, 'এইবার আমরা বসি, না—কি বলো ঠাকুরঝি? তোমার ছেলে কি এখনও কোথাও খায়নি ভেবেছো? খেয়েছে বোধহয়। আর না খেয়ে থাকে, এলেই খাবে।'

ছেলেকে রাখিয়া মার খাইবার ইচ্ছা তেমন ছিল না। তবু তাহাকে বসিতে হইল।

ইন্দু সধবা, সুকুমারী বিধবা। আমিষ-নিরামিষের ছোঁয়া-ছুঁয়ির ভয়ে দু-জনে একটুখানি দূরে-দূরেই খাইতে বসিল। খাওয়া তখনও তাহাদের শেষ হয় নাই, এমন সময় হারু ফিরিয়া আসিল। বলিল, 'না সুকুদি, শঙ্করকে কোথাও পেলাম না। কোথাও হয়তো পাড়ার কোনও ছেলের সঙ্গে খেলা করছে না কি, কিছুই বুঝতে পারছিনি।'

ইন্দু বলিল, 'তাহ'লে সে নিশ্চয়ই কোথাও খেয়েছে ঠাকুরঝি, তুমি খাও।'

কিন্তু খাও বলিলেই খাওয়া হয় না। ভাতগুলা সুকুমারী হাত দিয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

হারু বলিল, 'ভাগ্যিস্ বাবুদের ঠাকুরবাড়ীতে আজ আমাকে ডেকেছিল খেতে, নইলে কি হতো আজ তোমাদের?'

কথাটা যে সুকুমারীকেই বলা হইল, প্রথমে সে তাহা বুঝিতে পারে নাই। ইন্দু তখন হারুকে চোখ টিপিতেছে। কিন্তু হারু বোধহয় একটুখানি বোকা। চোখ টেপার ইঙ্গিতটা সে টেরও পাইল না। আপনমনেই সে আবার বলিয়া বসিল, 'আচ্ছা সুকুদি, রাখালদার স্ত্রীটা তোমাদের খুব কষ্ট দিচ্ছে, না?'

সুকুমারী মুখ তুলিয়া বলিল, 'কার কথা বলছিস্ হারু? আমাদের বৌএর কথা?'

হারু বলিল, 'হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তোমাদের কুমুর কথা বলছি।'

সুকুমারী বলিল, 'তা ভাই, তারই-বা দোষ কি বল্। সেও তো বিধবা-মানুষ, তারই-বা আছে কি যে, আমাদের ভার নেবে!'

হারু বলিল, 'তুমি জানো না সুকুদি, রাখালদা অনেক টাকা রেখে গেছে। আর, ধানের জমি যা আছে, তাইতে ওকে আর জীবনে কখনও ভাবতে হবে না। কিন্তু তা না হয় হলো, ধরলাম ওর কিছুই নেই, তাই বলে' তুমি কি

করবে শুনি ? তোমার কি আছে ? বাবুদের ঠাকুরবাড়ীতে অম্‌নি করে' ছেলে-মেয়ে নিয়ে ভিখিরীর মতন খেতে যাবে—আর ওরা অপমান করে' পাতা তুলে নিয়ে তাড়িয়ে দেবে ?'

সুকুমারী ভাবিয়াছিল, ঠাকুরবাড়ীর অপমানের কথাটা কেহ বোধহয় জানে না। অবাক হইয়া একবার সে হারুর মুখের পানে তাকাইল। বলিল, 'তুই এ-সব কেমন করে' জানলি হারু ?'

হারু বলিল, 'বা রে! সুকুদিকে এখনও তুমি বলোনি বৌদি ?'

এই বলিয়া সে ইন্দুর পানে একবার তাকাইল।

ইন্দু আবার চোখ টিপিল।

কিন্তু তখন আর চোখ-টেপা বৃথা। হারুই সব ফাঁস করিয়া দিল। বলিল, 'ঠাকুরবাড়ীতে আজ আমাকে খেতে ডেকেছিল, আমি নিজের চোখে দেখলাম যে! আর তাই-না দেখে এসেই দাদাকে বৌদিকে বললাম। বলতেই দাদা বললে—ডেকে নিয়ে আয় সুকুমারীকে। ওখানে ওর খাবার-থাকবার জায়গা না হয়, আমার এইখানে খাবে, এইখানেই থাকবে।'

এতক্ষণ পরে সুকুমারী বুঝিল যে, ইন্দুর ব্রতও মিথ্যা, একটি মেয়েকে খাওয়ানোর কথাও মিথ্যা। সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাই সে একবার ইন্দুর মুখের পানে তাকাইল। খাওয়া তখন তাহার শেষ হইয়া গেছে। সেও একবার সুকুমারীর মুখের দিকে তাকাইয়া ঈষৎ হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

আজ শুভদিন

খাওয়া-দাওয়ার পর সুকুমারী ও ইন্দু ঠাণ্ডাঘরের মেঝের উপর শুইয়া গল্প করিতেছিল।

ইন্দু বলিল, 'বেরূতো করার কথা তুমি বিশ্বাস করেছিলে?' বলিয়াই সে ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতে লাগিল।

হাসি থামিলেই আবার সে বলিল, 'কি করবো ভাই, তোমার দাদা বললে। বললে, 'এমনিতে যদি না আসে, না খায় তো বোলো তুমি বেরূতে করেছো। তাই বললাম ভাই, নইলে আমার মিছে কথা কখনও মুখ দিয়ে বেরোয় না।'

কিন্তু সুকুমারীর তখন একমাত্র চিন্তা—শঙ্কর। কোথায় গেল ছেলেটা? সে তো এমনি যায় নাই। ঠাকুরবাড়ীতে খাইতে যাইবার ইচ্ছা তাহার কোনোদিনই ছিল না, প্রত্যহ তাহাকে জোর করিয়া সেখানে লইয়া যাইতে হইত। সুকুমারীর মনে পড়িল, ইহার জন্য একদিন সে তাহার কাছে মারও খাইয়াছে। আজও হয়তো সে এমন করিয়া ছুটিয়া পালাইত না, যদি-না বাবুদের বুড়া সরকার নিজে আসিয়া তাহার পাতাটা পা দিয়া তুলিয়া ফেলিয়া না দিত। বুড়া সরকারেরই-বা কেমনধারা আক্কেল! তিনকাল গিয়া এককালে ঠেকিয়াছে, বুড়া আজ বাদে কাল মরিয়া যাইবে, আর সেই বুড়াই কিনা ছোট এই ছেলেটার দু-মুঠা ভাতে আসিয়া ধূলা দিল! সুকুমারী উঠিয়া দাঁড়াইল।

ইন্দু জিজ্ঞাসা করিল, 'উঠলে যে?'

সুকুমারী বলিল, 'দেখি একবার দুয়োরে দাঁড়িয়ে।'

ইন্দু বলিল, 'কি দেখবে ?'

—'ছেলেটাকে, দেখি ভাই আসছে কিনা।' বলিয়াই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিল, 'খায়নি সে কোথাও জানি আমি, হয়তো না-খেয়েই আছে। হতভাগা কারও কাছে মুখ ফুটে কিছু বলবে না তো।'

দেখা গেল, ঘরের মেঝের উপর শঙ্করী ইহারই মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সুকুমারী ধীরে-ধীরে তাহার গায়ে হাত দিয়া ইন্দুর কাছ হইতে তাহাকে একটুখানি সরাইয়া দিয়া বলিল, 'ঘুমোক্।'

বলিয়াই সে বাহিরের সদর দরজায় গিয়া দাঁড়াইল।

সদর দরজার পাশেই যে ঘরখানা ছিল, তাহারই দুয়ারের কাছে বসিয়া, ন্যাকড়া দিয়া নারায়ণ একটা 'বাইক'এর কলকব্জা পরিষ্কার করিতেছিল। এই বাইকে চড়িয়া প্রত্যহ সে গ্রাম হইতে দূরের একটা কয়লা-কুঠিতে চাকরি করিতে যায়। সেদিন রবিবার, ছুটির দিন, তাই তাহাকে যাইতে হয় নাই।

রাস্তা দিয়া ও-পাড়ার সতীশ যাইতেছিল, সুকুমারী জিজ্ঞাসা করিল, 'রাস্তায় কোথাও আমার ছেলেটাকে দেখেছো সতীশদা ?'

সতীশ থমকিয়া থামিল। সুকুমারীর মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, 'কই না, দেখিনি তো। কেন, কোথায় গেছে সে ?'

সুকুমারী বলিল, 'কি জানি ভাই, দুষ্টু ছেলে, ছুটে পালিয়ে গেল।'

সতীশ বলিল, 'পথে যদি কোথাও দেখতে পাই তো দেবো পাঠিয়ে।'

নারায়ণ ছিল সদর দরজার দিকে পিছন ফিরিয়া, কাজেই সুকুমারী কখন্ যে সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, বুঝিতে পারে নাই। এতক্ষণ পরে তাহার গলার আওয়াজ পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হলো রে সুকুমারী? খাওয়া হলো তোদের?'

ঘাড় নাড়িয়া সুকুমারী বলিল, 'হ্যাঁ দাদা, খেয়েছি। কিন্তু শঙ্কর যে কোথায় গেল—'

আর বেশী কিছু সে বলিতে পারিল না, আবার সে পথের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল।

নারায়ণ বলিল, 'আসবে সে ঠিক। ছেলেমানুষ—আছে হয়তো কোথাও ছেলেপুলের সঙ্গে···আচ্ছা, হ্যাঁরে সুকুমারী, তোদের বৌ কি তোদের খেতেও দিচ্ছে না?'

কথাটা সুকুমারী যে না শুনিল তাহা নয়, কিন্তু বড় কঠিন প্রশ্ন। কি যে সে জবাব দিবে প্রথমে ভাল বুঝিতে পারিল না। খাইতে দেয় বলিলেও মিথ্যা বলা হয়, আবার দেয় না বলিলেও দোষ। কারণ কুমুর কানে গিয়া কথাটা যদি ওঠে তো সে আর কিছু বাকি রাখিবে না। গত কয়েকদিন হইতে খাইতে সে তাহাদের সত্যই দেয় নাই। কিন্তু মাথা গুঁজিবার ঠাঁইটুকু এখনও তাহার সেইখানেই আছে। এবার যদি সে সেটুকু হইতেও তাহাকে বঞ্চিত

করে তো কোথায় গেলে সে যে একটুখানি আশ্রয় পাইবে কে জানে। নারায়ণের কথাটার জবাব দিতে তাই সে কেমন যেন ভয় পাইতেছিল। নারায়ণ তাহার মুখ দেখিয়া সেকথা বুঝিতে পারিল। বলিল, 'থাক্ আর বলতে হবে না। আমি সবই শুনেছি।'

সুকুমারীর একবার ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করে, কি সে শুনিয়াছে, কিন্তু জিজ্ঞাসা সে তাহাকে কিছুতেই করিতে পারিল না, তাহা ছাড়া মন তখন তাহার পড়িয়াছিল—ছেলেটার দিকে। এসব কোনও কথাই তাহার ভাল লাগিতেছিল না। যাহা শুনিয়াছে শুনুক্, যাহা জানিয়াছে জানুক্।

সুকুমারী বলিল, 'ছেলেটা এখনও এলো না নারাণদা, কোথায় যে গেল কিছুই বুঝতে পারছি না। খায়নি এখনও।'

নারায়ণ বলিল, 'খায়নি এখনও? সে কি রে? ...হারু! ও হারু!'

দাদার ডাক শুনিয়া দোতলা হইতে হারু নামিয়া আসিল। বলিল, 'আমায় ডাকছিলে দাদা?'

—'হ্যাঁ। ছাখ্ তো একবার, এই বাইক্ নিয়ে যা। সুকুমারীর ছেলেটাকে যেখানে পাস্ খুঁজে নিয়ে আয়।'

দাদার বাইকে একবার চড়িতে পাইলে হারু আর কিছুই চায় না। কতবার সে তাহার দাদাকে লুকাইয়া বাইক্ লইয়া পালাইয়া যায়, বোঁ করিয়া এদিক-ওদিক একচক্র ঘুরিয়া আসিয়াই আবার চুপি-চুপি বাইক্ রাখিয়া দিতে গিয়া কত-বার

ধরা পড়িয়া গালাগালি খায়, তবু সে বাইকে চড়িতে ছাড়ে না। আজ সেই বাইক্‌টাই কিনা তাহার দাদা নিজে বলিতেছে লইয়া যাইতে। হারু তখনি তাহার পরনের কাপড়টা বাগাইয়া লইয়া প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল।

সুকুমারী বলিল, 'দেখিস্ ভাই হারু, একবার ভাল করে' খুঁজে।'

—'সে আর আমায় বলতে হবে না।' বলিয়া হাত বাড়াইয়া বাইক্‌টা সেখান হইতে টানিয়া নামাইয়া সে পথে গিয়া দাঁড়াইল।

নারায়ণ বলিল, 'মিছিমিছি তুই আর ওখানে দাঁড়িয়ে কেন সুকুমারী, ভেতরে আয়।'

হারু চলিয়া গেলে পর সদর দরজাটা দু-হাত দিয়া ভেজাইয়া দিয়া সুকুমারী ভিতরে যাইতেছিল, নারায়ণ বলিল, 'শোন্ সুকু।'

সুকুমারী থমকিয়া দাঁড়াইল।

নারায়ণ বলিল, 'তোর দাদার বাড়ীতে থাকতে যদি তোর কষ্ট হয় তো ছেলে-মেয়ে নিয়ে তুই আমার এইখানেই থাক্।'

একথা সে যে বলিবে সুকুমারী তাহা ভাবে নাই। কথাটার আভাস হারু একবার তাহাকে দিয়াছিল বটে, কিন্তু তখন সে তাহা বিশ্বাস না করিয়া ভাবিয়াছিল—কথাটা মিথ্যা। ভাবিয়াছিল, বাবুদের ঠাকুরবাড়ীতে খাইতে গিয়া আজ তাহার যে লাঞ্ছনা হইয়াছে, সেই লাঞ্ছনার সংবাদ পাইয়াই নারায়ণ

বোধকরি দয়া করিয়া আজ তাহাকে এখানে খাইতে দিয়াছে এবং সে ব্যবস্থা বোধকরি শুধু আজিকার জন্যই।

কিন্তু নারায়ণের কথা শুনিয়া সে-ধারণা তাহার বদ্‌লাইয়া গেল। ভালই হইল। স্কুমারীও মনে-মনে তাহাই চাহিতে-ছিল। মাথা হেঁট করিয়া পায়ের নখ দিয়া মাটি খুঁটিতে-খুঁটিতে সে বলিল, 'কিন্তু আমি তো এম্‌নি থাকবো না তোমার বাড়ীতে নারাণদা, আজ থেকে আমাকে তাহ'লে তোমার এখানে একটা কাজ দাও।'

নারায়ণ তাহার মুখের পানে তাকাইয়া ঈষৎ হাসিল। বলিল, 'তোকে আবার কি কাজ দেবো রে পাগলী?'

স্কুমারী বলিল, 'তোমার বাড়ীতে আমি রান্না করবো আজ থেকে।'

নারায়ণ বলিল, 'তা বেশ, এমনি থাকতে তোর যদি লজ্জা করে তো রান্নাই না হয় করবি।'

স্কুমারী বলিল, 'হ্যাঁ দাদা, সেই ভাল।'

এই বলিয়া সে আবার একবার দরজার পানে তাকাইয়া বাড়ীর ভিতর গিয়া ঢুকিতেছিল, নারায়ণ জিজ্ঞাসা করিল, 'হ্যাঁ রে স্কুমারী, তোর বয়েস কত হলো?'

প্রশ্নটা কেমন যেন তাহার ভাল লাগিল না। নিতান্ত লজ্জিতভাবে কিছুক্ষণ সে তাহার নিজের দেহের পানে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মনে হইল যেন সে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়াই নীরবে দাঁড়াইয়া আছে।

নারায়ণ তাহার এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থাটা যে বুঝিল না তাহা নয়, বরং বুঝিতে পারিয়াই বলিল, 'হারুর চেয়ে তুই বছর-খানেকের বড়, না ?'

এতক্ষণে সুকুমারী কথা কহিল। ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'তিন-চার বছরের বড়।'

—'তিন-চার বছর ? তা হবে বইকি। তোর বড় ছেলেটারই বয়েস হলো বোধকরি সাত-আট বছর, না ?'

সুকুমারী বলিল, 'সাত বছর।'

নারায়ণ তাহাকে বলিবার মত আর কোনও কথাই বোধ হয় খুঁজিয়া পাইল না। সুকুমারীও তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

*

* *

আজ হইতে নারায়ণের বাড়ীতে ছেলে-মেয়ে লইয়া সুকুমারী বাস করিবে—কথাটা কুমুকে একবার জানানো দরকার। সুকুমারী তাই জানাইতে আসিয়াছিল।

কুমু বলিল, 'কেন, তোমার সইএর কাছে কিছু হলো না ?'

সুকুমারী বলিল, 'না বৌদি, ওরা বড়লোক, আর ওদের বাড়ীতে লোকজনের অভাব তো নেই।'

কুমু বলিল, 'তা আমি আগেই জানি।' বলিয়া সেদিক হইতে মুখ ফিরাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

সুকুমারী বলিল, 'তাহ'লে আমি যাই, নারাণদার বাড়ীতেই আজ থেকে থাকিগে।'

কুমু বলিল, 'তারই অনুমতি নিতে এসেছো নাকি ঠাকুরঝি?'

—'হ্যাঁ বৌদি।' বলিয়া হেঁটমুখে সে দাঁড়াইয়া রহিল।

কুমু তাহার ঠোঁটের ফাঁকে কেমন যেন একটুখানি বাঁকা হাসি হাসিল। হাসিয়া বলিল, 'তা বেশ তো। আমি কি তোমাকে বারণ করছি ঠাকুরঝি?'

সুকুমারী বলিল, 'না, তা কেন, তবে কিনা…'

কুমু উঠিয়া দাঁড়াইল এবং পিছন ফিরিয়া সেখান হইতে চলিয়া যাইবার সময় বলিয়া গেল, 'ঢং দেখলে গা জ্বালা করে!'

আর বেশী কিছু বলিবার প্রয়োজন হইল না। একটা কথা তাহার জিজ্ঞাসা করিবার ছিল, বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইবার পর ছেলেটা তাহার এখানে আসিয়াছিল কি না। কিন্তু সে-কথাও তাহার আর জিজ্ঞাসা করা হইল না, কাপড়-চোপড় যাহা কিছু তাহাদের এ-বাড়ীতে ছিল, ছোট একটি পুঁটুলিতে বাঁধিয়া লইয়া সুকুমারী বাহির হইয়া পড়িল।

নারায়ণের বাড়ী যাইতে যাইতে পথের মাঝে সুকুমারী কতবার যে দাঁড়াইল তাহার আর ইয়ত্তা নাই। ছোট ছোট

ছেলেরা হয়তো পথের ধারে খেলা করিতেছে, সেইখানেই থমকিয়া দাঁড়াইয়া সুকুমারী জিজ্ঞাসা করিল, 'হ্যাঁরে, আমাদের শঙ্করকে দেখেছিস্ তোরা কেউ?'

সকলেই ঘাড় নাড়িয়া বলে, 'না।'

এক-একবার ছেলেটার উপর রাগ হয়। মনে-মনেই বলে—ছি ছি। এমন ছেলেও গর্ভে ধরেছিলাম!...কার ওপর রাগ ক'রে তুই গেলি হতভাগা?...

শঙ্করীকে সে সঙ্গে আনে নাই। তাহাকে বলিয়া আসিয়াছে, 'দাদা এলে তাকে আর কোথাও যেতে দিস্‌নি, বলিস্, মা গেছে মামীমার বাড়ী, এক্ষুনি ফিরবে।'...

পথ চলিতে চলিতে সুকুমারী সেই কথাই ভাবিতেছিল। ভাবিতেছিল, হারুর ফিরিতে যখন এত দেরী হইল, তখন সে নিশ্চয়ই শঙ্করকে সঙ্গে লইয়াই ফিরিবে। বাড়ী ঢুকিয়াই দেখিবে হয়তো শঙ্কর ও শঙ্করী দু-জনে বসিয়া বসিয়া গল্প করিতেছে। ...হে মা কালী, হে মা দুগ্‌গা, তাই যেন হয়!

সোজা যে রাস্তাটা নারায়ণের বাড়ীর দিকে চলিয়া গেছে, সুকুমারী সে রাস্তাটা ছাড়িয়া দিয়া কামারপাড়ার পথ ধরিল। কামারপাড়ার পথের ধারে বুড়ো-শিবের মন্দির। এই মন্দিরের বাবার কাছে একবার সে একটি প্রণাম করিয়া শঙ্করের জন্য যাহোক্-কিছু মানত করিয়া যাইবে। কিন্তু সহায়-সম্বলহীনা অনাথা বিধবা সে, মানত করিবার মত কোনও সম্পদই তাহার নাই। কি মানত সে করিবে তাহাই

ভাবিতে ভাবিতে সুকুমারী পথ চলিতে লাগিল। আগামী বৎসর চৈত্র-সংক্রান্তির গাজনের সময় শঙ্কর ও সে, দু-জনে উপবাস করিয়া বাবার পূজা তো করিবেই, তাহা ছাড়া অন্যান্য 'দেয়াসী'দের সঙ্গে শঙ্করও না-হয় পথের ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া সমস্ত গ্রামখানিকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া আসিবে।

মন্দিরে গিয়া সুকুমারী তাহার কাপড়ের আঁচলটা গলায় জড়াইয়া একটি প্রণাম করিল।—'শঙ্করকে আমার এনে দাও বাবা! আমার যে আর কেউ নেই!'

বলিতে বলিতে তাহার দু-চোখ ছাপাইয়া জল গড়াইয়া আসিল। এবং তেমনি কাঁদিতে-কাঁদিতেই বুড়ো-শিবের পাথরের মন্দিরে সে বারবার মাথা ঠুকিয়া বাবার কাছে শঙ্করকে ফিরিয়া পাইবার কামনা জানাইয়া প্রণাম করিল। তাহার পর কাপড়ের পুঁটুলিটি হাতে লইয়া সুকুমারী আসিয়া দাঁড়াইল নারায়ণের বাড়ীর দরজায়। সেইখান হইতে সে প্রথমেই দেখিল—বাইক্‌টা যেখানে থাকে সেখানে সেটা আছে কিনা। দেখিল—বাইক্ রহিয়াছে। হারু তাহা হইলে ফিরিয়াছে নিশ্চয়ই। এত দেরী করিয়া যখন ফিরিয়াছে,—শঙ্করকে তখন যে সে সঙ্গে আনিয়াছে তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই।

সুকুমারী ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিল। দেখিল, ইন্দুর কাছে বসিয়া আছে শঙ্করী, আর অদূরে দাঁড়াইয়া আছে—হারু

একা। যাহাকে দেখিবার জন্য সে এতক্ষণ ধরিয়া ব্যাকুল হইয়া আছে, তাহার সেই শঙ্কর কোথায়?

হারু বলিল, 'শঙ্করকে তো কোথাও পাওয়া গেল না সুকুদি। গাঁয়ের প্রত্যেকটি বাড়ী আমি খুঁজে দেখেছি—কোথাও নেই।'

—'কোথাও নেই?' ···অবাক্ হইয়া সুকুমারী হারুর মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

তাহার এত যে আশা, দেবতার কাছে এত যে প্রার্থনা—সবই যে এমন করিয়া হারুর একটি মুখের কথায় ব্যর্থ হইয়া যাইবে তাহা সে ভাবিতে পারে নাই। ভাবিয়াছিল, একটুকু ছেলে—রাগ সে কোনোদিনই করে না, আজ যদিই-বা রাগ করিয়া চলিয়া গেছে, বেশিক্ষণ কোথাও সে থাকিতে পারিবে না।

নারায়ণ কোথায় গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিতেই হারুর মুখে শঙ্করের ফিরিয়া না-আসার কথাটা শুনিয়া কেমন যেন হেঁট-মুখে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—'হ্যাঁরে, সব জায়গা খুঁজেছিলি তো ভাল করে' ?'

হারু বলিল, 'বা-রে! খুঁজতে কি আর আমি বাকি রেখেছি কোথাও? এমন বাড়ী নেই যেখানে খুঁজিনি, তা-ছাড়া ভোলা বাগ্দী বললে, সে নাকি ছোট একটি ছেলেকে এই তেঁতুলপুকুরের পাড়ের ওপর দিয়ে যেতে দেখেছে, ব্যস্,

আমিও ছুটলাম সেইদিকে। বাইক্ নিয়ে মাঠের রাস্তা ধরে' একেবারে ফরিদপুর পর্য্যন্ত চলে' গেলাম—দেখলাম, কোথাও নেই।'

নারায়ণের মুখখানা চিন্তায় বিবর্ণ হইয়া উঠিল। চুপ করিয়া কি যেন ভাবিয়া বলিল, 'তাহ'লে কোথায় গেল সে? তুই এক কাজ কর্ হারু। বাইক্ নিয়ে একবার থানায় যা। গিয়ে সেখানে একটা ডায়েরী লিখিয়ে দিয়ে আয়।'

সুকুমারী কাছেই দাঁড়াইয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিল, 'থানায় ডাইরি করলে পাওয়া যাবে, দাদা?'

নারায়ণ বলিল, 'হ্যাঁ, পাওয়া হয়তো যেতেও পারে।'

—'তবে তাই যা ভাই হারু, রাত্তির হয়ে যাবে···পারবি তো যেতে?'

হারু বলিল, 'বাইকে আলো জ্বেলে নেবো।'

সুকুমারী বলিল, 'আচ্ছা দাদা, ছেলেধরায় ধরে' নিয়ে গেল না তো?'

নারায়ণ বলিল, 'না রে না, ছেলেধরা বলে' কোথাও কিছু নেই, ও-সব বাজে কথা। গেছে হয়তো রাগ করে' কোথায় চলে'। বেশি দূর যেতে তো পারবে না, কাছাকাছিই কোথাও আছে।'

হারু তখন বাইকের আলো ঠিক করিতেছিল। সুকুমারী বলিল, 'যাও ভাই, তুমি চট্ করে' যাও, আমার জন্যে অনেক কষ্টই তো করলে, আর একটুখানি করো।'

—'বামুনদের তো বুঝলাম, কার ছেলে তুই, তোর বাবার নাম কি?'

শঙ্কর বলিল, 'আমার বাবাকে আপনি চিনবেন না, আমার বাড়ী এখান থেকে অনেক দূর।'

—'এখানে কোথায় এসেছিস্?'

শঙ্কর মাথা হেঁট করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, 'আসিনি কোথাও। কাল সকালে আবার চলে' যাবো।'

—'কোথায় যাবি?'

সুমুখে আঙুল বাড়াইয়া শঙ্কর বলিল, 'এইদিকে।'

—'এইদিকে কোথায় যাবি রে? তুই কি পাগল নাকি?'

চারিদিক হইতে গুঞ্জন উঠিল। কেহ বলিলেন, 'পাগল নয়।'

কেহ বলিলেন, 'পথ হারাইয়াছে।'

কেহ বলিলেন, 'রাগ করিয়া আসিয়াছে।'

কেহ-বা বলিলেন, 'গরীবের ছেলে।'

এবং আরও কয়েকজন কি যে বলিলেন কিছুই ভাল শোনা গেল না। এবং এই এতগুলি ভদ্রলোকের প্রশ্নের মাঝখানে বেচারা শঙ্কর একেবারে সব-কিছুর খেই হারাইয়া ফেলিয়া বোকার মত হতভম্ব হইয়া গেল। গৃহস্বামী দেখিলেন, তাহার চোখ দিয়া টপ্‌টপ্‌ করিয়া জল পড়িতেছে।

জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কাঁদছিস্ কেন রে?'

শঙ্কর ভাবিল, ইহাদের কাছে যদি সে তাহার সত্য

পরিচয় দেয়, তাহা হইলে এখনই হয়তো ইহারা আবার তাহাকে তাহার মায়ের কাছেই পাঠাইয়া দিবে। তাই সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'আমার কেউ নেই, আমি চাকরের কাজ করবো।'

—'তাই বল্!'

যিনি বলিয়াছিলেন গরীবের ছেলে, তাঁহার কথাই সত্য হইল দেখিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'দেখলে? আমি ঠিকই বলেছিলাম। মানুষের চেহারা দেখলে আমি বুঝতে পারি।'

অথচ শঙ্করের চেহারা দেখিয়া ঠিক তাহার উল্‌টা কথাটাই মনে হয়। মনে হয়—হয়তো কোনও বড়লোকের ছেলে, রাগ করিয়া বাড়ী হইতে পালাইয়া আসিয়াছে।

বাড়ীর মালিক প্রিয়নাথবাবু ছেলেটার মুখের পানে ঘন ঘন তাকাইতেছিলেন। মনে তাঁহার বোধকরি দয়া হইয়াছে। শঙ্করের গায়ে হাত দিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হ্যাঁরে, তোর ক্ষিদে পায়নি?'

কোঁচার খুঁটে চোখ দুইটা শঙ্কর তখন মুছিয়া ফেলিয়াছে। নীরবে শুধু সে তাহার মাথাটা একবার কাত করিল।

প্রিয়নাথবাবু ডাকিলেন, 'ফকির!'

—'হুজুর!' বলিয়া ফকির আসিয়া হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইল। ফকির—তাঁহার চাকরের নাম।

প্রিয়নাথবাবু বলিলেন, 'একে নিয়ে যা বাড়ীর ভেতর। বামুনের ছেলে, খেতে-টেতে দেয় যেন। তারপর আমি যাচ্ছি।'

শঙ্করকে সঙ্গে লইয়া ফকির বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

*

* *

শঙ্কর ভাবিয়াছিল, এইখানেই বুঝি তাহার থাকিবার ব্যবস্থা হইয়া যাইবে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহা আর হইল না। প্রিয়নাথবাবুর ইচ্ছা ছিল—সে এইখানেই থাকে, কিন্তু তিনি অব্রাহ্মণ, জাতিতে তিলি। প্রিয়নাথবাবুর গৃহিণী বলিলেন, 'না বাপু, ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করি, বামুনের ছেলে, কোন্‌দিন কি বলে' বসবো, অপরাধ হবে, তার চেয়ে কাজ নেই, ওকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দাও।'

প্রিয়নাথ বলিলেন, 'কোথায় পাঠাবো! আহা, বেচারার কষ্ট হবে, তার চেয়ে থাক্ না, ওকে তোমার কিছু বলবার কি দরকার?'

গৃহিণী বলিলেন, 'আজ হয়তো কিছু বলবো না, কালও বলবো না, কিন্তু থাকতে-থাকতেই ছেলেপুলের সামিল হয়ে যাবে, কি যে কখন্ বলে' ফেলবো তার ঠিক নেই।'

এমনি করিয়া কর্ত্তা ও গিন্নির মতান্তর ঘটিয়া গেল বলিয়া

শঙ্করের সেখানে বেশিদিন থাকা চলিল না। প্রিয়নাথবাবু বলিলেন, 'আচ্ছা, থাক্ ও এইখানে দিনকতক, তারপর ওর একটা বন্দোবস্ত আমি করে' দিচ্ছি।'

ছেলেটার কি বন্দোবস্ত করিবেন প্রিয়নাথবাবু তাহাই ভাবিতেছিলেন, এমন দিনে পরেশগঞ্জ হইতে তাঁহার এক জমিদার বন্ধু আসিলেন তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে। দেখা করিয়াই তাঁহার চলিয়া যাইবার কথা। প্রকাণ্ড মোটরকার বাহিরের দরজায় অপেক্ষা করিতেছিল।

কথাবার্ত্তা শেষ হইতেই প্রিয়নাথবাবু বলিলেন, 'ছোট একটি ছেলেমানুষ চাকরের দরকার আছে আপনার বিজয়বাবু?'

—'চাকর?' বিজয়বাবু বলিলেন, 'কোথায়? আছে নাকি আপনার সন্ধানে?'

প্রিয়নাথবাবু ডাকিলেন, 'শঙ্কর!'

শঙ্কর ধীরে ধীরে তাঁহাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

বিজয়বাবু তাহার মুখের পানে তাকাইয়া সেদিক হইতে আর চোখ ফিরাইতে পারিলেন না। দেখিলে তো ইহাকে চাকর বলিয়া মনে হয় না।

প্রিয়নাথবাবু বলিলেন, 'গরীবের ছেলে, বেচারার মা-বাপ কেউ কোথাও নেই।'

বিজয়বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার নাম কি?'

—'শঙ্কর।'

প্রিয়নাথবাবু বলিলেন, 'বামুনের ছেলে। আমার ইচ্ছা

ছিল এইখানেই রাখি। কিন্তু আমার স্ত্রী বলে, না বাপু, বামুনের ছেলে, মনের ভুলে কোন্‌দিন কি বলে' ফেলবো, হয়তো পাপ-অপরাধ হবে, তার চেয়ে…'

কথাটা তখনও তাঁহার শেষ হয় নাই। বিজয়বাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। শঙ্করের কাঁধে হাত দিয়া বলিলেন, 'চলো।'

শঙ্কর তাঁহার পিছু পিছু গিয়া তাঁহারই নির্দ্দেশমত মোটরের উপর চড়িয়া বসিল।

সোফার গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

প্রিয়নাথবাবু হাতজোড় করিয়া নমস্কার করিলেন। দোতলার একটা জানলার খড়খড়ি খুলিয়া গেল। তাঁহার গৃহিণী একাগ্র-দৃষ্টিতে এই দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন।

*

* *

সে-রাত্রে ইন্দু সুকুমারীকে রান্না করিতে দিল না। সম্ভবত সে ভুল বুঝিল। রান্না করিতে দিলেই বোধকরি ভাল করিত। সুকুমারী অন্তত অন্যমনস্ক হইয়া থাকিবার সুযোগ পাইত, কিন্তু শঙ্করের মত এমন সুন্দর ছেলে যাহার রাগ করিয়া নিরুদ্দেশ হইয়া যায়, সামান্য রান্নার কাজ লইয়া অন্যমনস্ক হইয়া থাকা বোধকরি তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, ইন্দুর নিষেধ সে শোনে নাই, নিজের হাতে রান্না

না করিলেও রান্নার কাজে সাহায্য সে বরাবরই করিতেছিল, কিন্তু মন তাহার পড়িয়া রহিল শঙ্করের দিকে। ...ছেলেটা কোথায় গেল, কেন গেল, কোথায় রহিল, বাঁচিল কি মরিল কে জানে। এমন করিয়া ছেলে চলিয়া যাইতে সে কাহারও দেখে নাই। অদৃষ্ট যাহার খারাপ হয়, তাহার বুঝি এমনি করিয়াই যায়। কিন্তু ছি-ছি, হতভাগা ছেলে এতক্ষণ এই অন্ধকার রাত্রে কোথায় রহিয়াছে? কেহ যদি একটুখানি আশ্রয় তাহাকে না দিয়া থাকে তো উপবাস করিয়াই হয়তো সে কোনও গাছের তলায় পড়িয়া আছে। না খাইয়া কতদিন কাটাইবে? পরনে একখানি ছেঁড়া কাপড়, সঙ্গে একটি পয়সাও নাই, দু-দিন পরে দুর্দ্দশার হয়তো অন্ত থাকিবে না, কেহ হয়তো ধরিয়া মারিবে, কত জায়গায় লাঞ্ছিত হইবে, অপমানিত হইবে এবং এমনি করিয়াই একদিন হয়তো সে অসুখে পড়িবে, মুখে একফোঁটা জল দিবার কেহ কাছে থাকিবে না, রোগের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পিপাসার্ত্ত কণ্ঠে 'মা মা' বলিয়া চীৎকার করিবে, তাহার পর একদিন হয়তো কোন্ পথের ধারে, কিম্বা হয়তো কোন্ জনহীন প্রান্তরের মাঝখানে মরিয়া পড়িয়া থাকিবে, তাহার এই অভাগী দুঃখিনী মার কাছে সে সংবাদটাও হয়তো আসিয়া পৌঁছিবে না।... সুকুমারীর দু-চোখ বহিয়া দর্দর্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে সে তাহার দু-হাত বাড়াইয়া শঙ্করীকে বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া সেইখানেই শুইয়া পড়িল।

খাওয়া সে-রাত্রে তাহার একরকম হইল না বলিলেই হয়। না খাইয়া উপবাস করিয়া শঙ্কর তাহার চলিয়া গেছে। সেই-বা আজ খাইবে কেমন করিয়া। আহারের গ্রাস তাহার মুখে যেন কিছুতেই উঠিতে চাহিল না। না বসিলে নয়, তাই ইন্দুর পীড়াপীড়িতে খাইতে একবার সে নামমাত্র বসিল। বসিয়াই আবার উঠিয়া পড়িল।

এমনি করিয়া দিনের পর দিন কান্না আর সুকুমারীর কিছুতেই থামিতে চায় না। ভাবিয়া ভাবিয়া সারা হয়, আর কাঁদিয়া কাঁদিয়া দিন কাটে।

ইন্দু তাহাকে কতরকম করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করে, নারায়ণ বুঝায়, হারু বুঝায়, কিন্তু মায়ের মন বুঝিতে কিছুতেই চায় না।

ইন্দু বলে, 'ছেলে তো আর তোমার মরেনি ভাই, এমন করে' কেঁদো না, ছেলের অমঙ্গল হবে যে!'

অমঙ্গলের কথাটা শুনিয়া সুকুমারী জোর করিয়া তাহার কান্না চাপিয়া চুপ করিয়া রহিল। মনে হইল—সত্যই তো! মা যদি তাহার মঙ্গল প্রার্থনা না করিয়া এমনি দিবারাত্র পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিতে থাকে তো ছেলের অমঙ্গলও হয়তো হইতে পারে।

সুকুমারী বলিল, 'কিন্তু ভাই, এ যে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। ছেলে অনেকেরই মরে। মরলেও-বা বুঝি—মরে' গেল, কি আর করবো, মরার ওপর হাত নেই। আর

এ যে একেবারে এই ছিল এই নেই। অথচ বেঁচে হয়তো আছে, মরার কথা ভাবতেও আমার—'

বলিতে বলিতে ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল।

জোর করিয়া কান্না চাপিয়া চাপিয়া আজকাল ওই একটা নূতন উপসর্গ তাহার আসিয়াছে। কাহারও সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে অন্যমনস্কের মত হঠাৎ এক কথা বলিতে আর-এক কথা বলিয়া বসে, কিম্বা হয়তো বিনা কারণেই চোখ দুটা তাহার ছল্‌ছল্‌ করিয়া আসে, জোর করিয়া বারে বারে চোখ মুছিয়াও চোখের জল কিছুতেই রোধ করিতে পারে না।

এমনি করিয়া দিন-পাঁচ-ছয় কাটিল।

শোকের মাত্রা তখন কম হইয়া আসিয়াছে। সময়ে পুত্রের মৃত্যুশোকও মানুষ ভুলিয়া যায়। এ তো শুধু ছেলে তাহার পালাইয়া গিয়াছে। ভরসা আছে—আবার হয়তো সে একদিন ফিরিয়া আসিতেও পারে। আর তাছাড়া এটা পরের বাড়ী, অনুগ্রহ করিয়া ইহারা তাহাকে আশ্রয় দিয়াছে মাত্র, এখানে যদি সে দিবারাত্রি কাঁদিয়া-কাটিয়া অনর্থক একটা অস্বস্তিকর আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া রাখে তাহা হইলে বড় খারাপ দেখায়। তাই সে আজকাল আপনা হইতেই অনেকটা শান্ত হইয়া আসিয়াছে। সংসারের কাজকর্ম্ম করিয়া অধিকাংশ সময় নিজেকে ভুলাইয়া রাখে।

পরিবার কাপড়খানি সুকুমারীর ছিঁড়িয়া গিয়াছিল, নারায়ণ

সেদিন তাহার জন্য একজোড়া নূতন কাপড় আনিয়া দিয়াছে। ইন্দুর সঙ্গে পুকুরে গিয়াছিল স্নান করিতে, কতদিন সে তাহার মাথার চুল পরিষ্কার করে নাই, একপিঠ কালো কোঁক্‌ড়ানো চুল তাহার অবহেলায়-অযত্নে বিশ্রী হইয়া ছিল, ইন্দু সেদিন জোর করিয়া তাহার গায়ে-মাথায় সাবান মাখাইয়া পরিষ্কার করিয়া দিল। গায়ের রং সুকুমারীর এম্‌নিতেই যেন দুধে-আলতায় গোলা, তাহার উপর সাবান মাখিয়া নূতন কাপড় পরিয়া সেদিন তাহার যৌবনের রূপ যেন আবার ফিরিয়া আসিল।

ইন্দু বলিল, 'তা ভাই, ভগবান তোমাকে গরীবের ঘরে পাঠালে কি হবে, রূপ দিয়েছিল দু-হাত ভরে'—আশা মিটিয়ে।'

সুকুমারী বলিল, 'তা, আমার সে রূপ নিয়ে কি হলো ভাই? এখন মনে হয়, এ-রূপ যেন আমার না থাকলেই ভাল হতো।'

ইন্দু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কি যেন ভাবিল। ভাবিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'তোমার রূপ দেখলে সত্যিই হিংসে হয় ভাই। এই রূপ যদি আমি পেতাম।'

সুকুমারী বলিল, 'কেন, তোমার যা আছে তাই-বা কম কিসের? ওতেই তো দাদা আমার—'

এই বলিয়া আজ বহুদিন পরে সুকুমারী একটুখানি হাসিল।

ইন্দু আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'বাইরে থেকে তাই মনে হয়, না?'

কথাটার মানে সুকুমারী ভাল বুঝিতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল, 'কি মনে হয় বাইরে থেকে?'

—'মনে হয়, তোমার দাদা আমাকে খুব ভালবাসে।'

সুকুমারী বলিল, 'বাসে না?'

হঠাৎ কি যেন মনে হইতেই কথাটা ইন্দু তখনি পাল্‌টাইয়া লইল। বলিল, 'হ্যাঁ, বাসে। ভালবাসবে না কেন ভাই! তবে, আমার আরও রূপ থাকলে মনে হয়, আরও ভালবাসতো।'

এসব ভালবাসাবাসির কথা সুকুমারীর আর ভাল লাগিতেছিল না। সে চুপ করিয়া রহিল।

ইন্দু বলিল, 'চলো, আর রাত করে' লাভ নেই। ঠাকুরপো তো খেয়েছে, এইবার ওকে খেতে দিইগে চলো।'

দু-জনেই রান্নাঘরে গিয়া ঢুকিল। সুকুমারী বলিল, 'আসন পেতে ঠাঁইটা তুমি করে' দাও বৌ, আমি ভাত বাড়ি।'

এই বলিয়া সুকুমারী ভাত বাড়িতে বসিল।

নারায়ণকে ডাকিতে হইল না, কাছেই কোথায় ছিল—একেবারে রান্নাঘরে আসিয়া দাঁড়াইল।

ইন্দু তাহার মাথার কাপড়টা টানিয়া লইয়া বলিল, 'বোসো।'

নারায়ণ তাহার নির্দ্দিষ্ট আসনের উপর বসিল বটে, কিন্তু

সহসা সেই স্বল্পালোকিত গৃহমধ্যে কর্ম্মরতা সুকুমারীর দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িতেই সেদিক হইতে সে যেন আর চোখ ফিরাইতে পারিল না। বিধবা এই সুন্দরী মেয়েটিকে সে বহুবার দেখিয়াছে, কিন্তু সে যে এত সুন্দরী—তাহা সে ইহার আগে কোনোদিন কল্পনাও করিতে পারে নাই। নিতান্ত গরীবের মেয়ে, নিতান্ত গরীবের স্ত্রী—আভরণ তাহার অঙ্গে ইহার আগেও কোনোদিন ছিল না, আজও নাই, শুধু তাহার ছিন্ন বস্ত্রটি পরিত্যাগ করিয়া তাহারই আনিয়া-দেওয়া নূতন বস্ত্রটি সে পরিয়াছে, আর মাথায় চুল দিয়াছে খুলিয়া—ইহাতেই আজ তাহাকে অসামান্যা সুন্দরী বলিয়া মনে হইতেছে।

ভাতের থালা সুকুমারী তাহার সুমুখে আনিয়া ধরিয়া দিতেই নারায়ণ খাইতে আরম্ভ করিল। মুখ তুলিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কে রান্না করেছে?'

ইন্দু বলিল, 'কেন, জানো না নাকি? রোজ যে করে সে-ই করেছে।'

নারায়ণ বলিল, 'সুকুমারী?'

ইন্দু বলিল, 'হ্যাঁ গো, সে-ই তো করে রোজ।'

সুকুমারী ফিরিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন দাদা? রান্না কি খারাপ হয়েছে? খারাপ হলে' বোলো কিন্তু।'

—'খারাপ?' বলিয়া ঈষৎ হাসিয়া নারায়ণ মুখ তুলিয়া

সুকুমারীর মুখের পানে তাকাইল। বলিল, 'না, খারাপ হয়নি। হলে' বলবো।'

তাহার পর খাইতে খাইতে একবার সুকুমারীর দিকে, একবার ইন্দুর দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া সে বলিতে লাগিল, 'সুকুমারীর কাপড়টা ওকে বেশ মানিয়েছে, না?'

ইন্দু হাসিল। বলিল, 'বোনের সঙ্গে রসিকতা হচ্ছে নাকি? চুল-পাড় কাপড়, বিধবা মেয়ে—ওর আবার মানা-মানি কি?'

নারায়ণ বোধকরি তাহার স্ত্রীর এই মন্তব্যে একটুখানি অপ্রতিভ হইল। বলিল, 'না, তা নয়, সুকুমারী যা পরে ওকে তাই মানায়।'

এই বলিয়া একটুখানি থামিয়া সে আবার একবার সুকুমারীর দিকে তাকাইল।—বলিল, 'এখন তবু দুঃখে-শোকে চেহাবা ওর খারাপ হয়ে গেছে, আগে যদি দেখতে তো বুঝতে।'

সুকুমারীর রূপ যে তাহার স্বামীর চোখে পড়িয়াছে, সে-কথা ইন্দু বুঝিল। কিন্তু তাহা সে চায় না বলিয়াই হোক্‌, কিম্বা অন্য কোনও কারণেই হোক্‌, চোখ টিপিয়া নারায়ণকে সে একবার নিষেধ করিল।

তাহার সে নিষেধের ইঙ্গিত নারায়ণ কিন্তু বুঝিয়াও বুঝিল না। বলিল, 'সুকুমারীই ছিল আমাদের গ্রামের সেরা সুন্দরী, আর ছিল ওর ওই সই—বাবুদের বাড়ীর মেয়ে—

সুরবালা। তা, বাবুদের বাড়ীর মেয়ের মত সুখে যদি ও থাকতে পেতো তাহ'লে—'

ইন্দু কিন্তু কথাটা তাহাকে আর শেষ করিতে দিল না। নারায়ণের কথার মাঝখানেই সে চীৎকার করিয়া উঠিল, 'থামো। খাবে, না ওর রূপ বর্ণনা করবে?'

লজ্জায় সুকুমারী যেন একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়া গেল, আর নারায়ণ বোধকরি নিজেকে অপমানিত বোধ করিয়া রাগিয়া ইন্দুর মুখের পানে কট্‌মট্ করিয়া তাকাইয়া মাথা হেঁট করিয়া নীরবেই খাইতে লাগিল।

রাত্রে ইন্দুর সঙ্গে নারায়ণ ভাল করিয়া কথা কহিতেছে না দেখিয়া ইন্দু বলিল, 'রাগ করেছো তো?'

নারায়ণ চুপ করিয়া রহিল।

ইন্দু তাহার আরও কাছে সরিয়া আসিল। বলিল, 'তা বাপু, রাগ করলে কি আর করবো। সোমত্ত মেয়ে, তার ওপর অত রূপ, চব্বিশ-ঘণ্টা আমার ভয় করে।'

এইবার নারায়ণ কথা কহিল। বলিল, 'তাই বুঝি তখন ওর সাক্ষাতে আমাকে অপমান করলে, না?'

কথার ধরন এবং মুখের চেহারা দেখিয়া ইন্দুর বুকের ভিতরটা ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল। গালে হাত দিয়া চোখ দুটা বড় বড় করিয়া বলিল, 'হেই মা, তোমায় অপমান আবার করলাম কখন গো!'

নারায়ণ তেমনি দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল।—'হ্যাঁ, ওকেই অপমান করা বলে।'

ইন্দু বলিল, 'তা—আমি না জেনেই বলেছি বাপু।'

নারায়ণ গম্ভীর মুখে পাশ ফিরিয়া শুইল। ইন্দুও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

তারপর হঠাৎ কি ভাবিয়া ইন্দু বলিয়া উঠিল, 'ওগো, শুনছো ?'

নারায়ণ জবাব দিল না।

ইন্দু তাহার গায়ে হাত দিয়া আবার বলিল, 'ঘুমোলে নাকি ?'

নারায়ণ বলিল, 'কি ?'

—'ছাখো, তোমার পায়ে ধরে' বলছি—তুমি যেন ওর মুখের পানে অমন করে' তাকিয়ো না। বিধবা মেয়ে, এতে কত পাপ হয় জানো ?'

নারায়ণ বলিল, 'হ্যাঁ, জানি জানি, চুপ করো।'

নিতান্ত তাচ্ছিল্যভরে কথাটা বলিয়া সে যেমন পাশ ফিরিয়া চুপ করিয়া শুইয়াছিল তেমনি শুইয়াই রহিল।

ইন্দু আর কোনও কথা বলিতে সাহস করিল না।

পরদিন হইতে ব্যাপারটা এমনি দাঁড়াইল যে, ইন্দু আর পারতপক্ষে সুকুমারীকে তাহার স্বামীর কাছে যাইতে দেয় না, দিবারাত্র চোখে-চোখে রাখে। রবিবার ছাড়া অন্যান্য

দিন সকাল ন-টার মধ্যে নারায়ণকে রাঁধিয়া-বাড়িয়া চারটি খাওয়াইয়া দিতে হয়। খাইয়া সে বাইকে চড়িয়া কাছাকাছি একটা কয়লাকুঠিতে চাকরি করিতে যায়। ফিরিয়া আসে সন্ধ্যার কিছু আগে। ইন্দু একটুখানি আরামপ্রিয়, কাজকর্ম্ম তেমন গা করিয়া কোনোদিনই সে করে না। সন্তানাদি নাই, একা মানুষ, তবু কেমন যেন কাজের চাপ একটুখানি বেশি পড়িলেই চীৎকার করিয়া বকিয়া-ঝকিয়া সারা হয়। সুকুমারীকে যে এখানে আনা হইয়াছে তাহার আসল উদ্দেশ্য—যতটা না তাহাকে সাহায্য করা, তাহার চেয়ে সুকুমারীর সাহায্যটা গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যই ছিল ইন্দুর মনে সবচেয়ে বেশি। ভাবিয়াছিল, এবার সে কিছুদিন হাত-পা ছড়াইয়া শুইয়া বাঁচিবে। সুকুমারী আসিবার পর হইতে সেই নিয়মই চলিতেছিল। অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া অবধি রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত সুকুমারীর কাজের কামাই ছিল না। ইন্দু কোনও কাজ করিতে গেলেই সুকুমারী তাহার হাতের কাজ কাড়িয়া লইয়া বলিত, 'তুমি চুপ ক'রে বোসো ওইখানে। আমি যখন পারবো না তখন তোমায় ডাকবো।'

কিন্তু তাহার পরদিন হইতে তাহার ব্যতিক্রম হইতে লাগিল।

বেলা ন-টার সময় নারায়ণের খাবার চাই। সুকুমারীর যখন ঘুম ভাঙে, বাড়ীর আর কেহ তখন জাগে না। বাসি-

কাজ শেষ করিয়াই উনান ধরাইয়া সুকুমারী স্নান করিয়া আসে। তাহার পর রান্না চড়াইয়া চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া শঙ্করের কথা ভাবে। বাড়ীতে ক'জনই-বা মানুষ, কি-ই-বা তাহাদের কাজ!

সকালে সুকুমারীই নারায়ণকে চা তৈরি করিয়া দেয়, কিন্তু সেদিন দেখা গেল, ইন্দু নিজে চা করিতে বসিয়াছে।

সুকুমারী কিছুই বুঝিতে পারে নাই। বলিল, 'আজ আবার এ-কি রকম হলো বৌ?'

ইন্দু ঈষৎ হাসিয়া আসল উদ্দেশ্যটা চাপা দিবার জন্যই বোধকরি বলিয়া বসিল, 'সবই কি তোমায় করতে হবে নাকি ঠাকুরঝি? দু-একটা কাজ না করলে আমারই-বা চলবে কেন?'

চা তৈরি করিয়া চায়ের বাটি সে নিজের হাতে স্বামীর কাছে ধরিয়া দিয়া আসিল।

নারায়ণের কিন্তু বুঝিতে বাকি রহিল না।

তাহার পর খাইতে গিয়াও নারায়ণ দেখিল, ব্যবস্থা অন্য রকম। ইন্দু নিজে আসিয়া তাহার খাবার থালা ধরিয়া দিয়া গেল।

সুকুমারী আপত্তি করিল না। আপত্তি করিবার আর আছেই-বা কি!

কিন্তু বোকা মেয়ে তখনও কিছুই বুঝিতে পারে নাই।

বুঝিতে অবশ্য তাহার বেশি দেরিও হইল না।

আজ শুভদিনে

আশপাশের গ্রামে বসন্ত রোগ দেখা দিয়াছিল সে-বছর বড় বেশি। শহর হইতে একজন টিকাদার আসিয়া প্রায় প্রত্যহই গ্রামের প্রত্যেক বাড়ীতে বাড়ীতে বসন্তের টিকা দিতেছিল। কিন্তু গ্রামের কয়েকজন প্রাচীন ব্যক্তি সেদিন একজোট হইয়া এই মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, ওসব টিকায় কিছু হইবে না, ঘরে ঘরে চাঁদা তুলিয়া এইসময় খুব ধুমধাম করিয়া মা মনসা এবং মা শীতলার পূজার বন্দোবস্ত করা হোক্। তাহা হইলেই এ গ্রামে আর ওসব মারাত্মক ব্যাধি প্রবেশ করিতে পারিবে না।

শেষ পর্য্যন্ত তাহাই স্থির হইল। ঘরে ঘরে চাঁদা তোলা শুরু হইয়া গেল।

প্রকাণ্ড গ্রাম। মা-মনসা ও মা-শীতলার নামে চাঁদা দিতে কসুর কেহই করিল না। গ্রামের মধ্যে যথেষ্ট আড়ম্বর করিয়া পূজার ধুমধাম তো আরম্ভ হইলই, এমন-কি দশ-পনেরো দিন ধরিয়া বারোয়ারী···মনসা-তলায় মস্ত একটা মেলা বসিয়া গেল। দিবারাত্রি কীর্ত্তন চলিতে লাগিল, কলিকাতা হইতে প্রসিদ্ধ অপেরা-পার্টির যাত্রাগান আসিল।

রাত্রে যাত্রাগান হইবে। সামিয়ানা খাটাইয়া প্রকাণ্ড আসর তৈরি হইয়াছে। আজ এই এত আনন্দ-উৎসবের দিনে গ্রামের ছেলে-মেয়েরা হাসিয়া-খেলিয়া ঘুরিয়া বেড়াই-তেছে, শঙ্কর থাকিলে আজ সে-ও তাহাতে যোগ দিত,—এই দুঃখে ম্রিয়মান হইয়া সুকুমারী সেদিন সন্ধ্যা হইতে

কাঁদিতে বসিল। রাত্রে আহারাদির পর যাত্রা শুনিতে যাইবার জন্য ইন্দু সাজগোছ করিতে লাগিল, হারু তাহাদের লইয়া যাইবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে, নারায়ণ তো আগেই সেখানে চলিয়া গেছে, এমন সময় সুকুমারী বলিল, তাহার মন খারাপ। যাত্রা শুনিতে সে যাইবে না।

ভালই হইল। বাড়ীতে একজন লোক থাকা দরকার। জিনিসপত্র রহিয়াছে, অথচ চোর-চণ্ডালের ভয়, ইন্দু বলিল,—'তবে তুমি থাকো ভাই বাড়ীতে, আমি চললাম।'

সুকুমারী বলিল, 'যাও। আমি বাইরের দরজায় খিল বন্ধ করে' দিচ্ছি।'

ভিতর দিক হইতে খিল বন্ধ করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও ইন্দু বাহিরের দরজায় একটা তালা বন্ধ করিয়া, চাবিটা নিজের খুঁটে বাঁধিয়া নিশ্চিন্ত মনে যাত্রা শুনিতে গেল।

ওদিকে সংবাদটা নারায়ণ শুনিল হারুর মুখে। হারু বলিল, 'সুকুদি এলো না। বললে, ওর মনটা ভাল নেই।'

নারায়ণ বলিল, 'বাড়ীতে একাই রইলো?'

—'হ্যাঁ, ও তোমার ঘরে শুয়ে থাকবে বললে।'

—'সদর দরজা কি খুলেই রেখে এলি?'

হারু বলিল, 'না। ভেতর থেকে সুকুদি খিল বন্ধ করে' দিলে। আর বাইরে থেকে বৌদি তালা বন্ধ করে' এলো।'

—'তালার চাবি কার কাছে?'

—'বৌদির খুঁটে।'

নারায়ণ জিজ্ঞাসা করিল, 'বৌদিকে তোর বসিয়ে দিয়েছিস্ ভাল জায়গায় ?'

হারু বলিল, 'হ্যাঁ, ওই যে চিকের আড়ালে—মেয়েরা যেখানে বসেছে, ওইখানেই বসলো। আমায় মাঝে মাঝে খবর নিতে বললে।'

যাত্রা তখনও আরম্ভ হয় নাই। কলিকাতার নাম-করা অপেরা-পার্টি। সংবাদ পাইয়া বহুদূরের গ্রাম হইতে লোক আসিয়াছে যাত্রা শুনিবার জন্য। প্রকাণ্ড মাঠ। লোকে লোকে একেবারে লোকারণ্য হইয়া উঠিয়াছে।

নারায়ণ বলিল, 'বেশ ভাল পালা হবে আজ। বৌদিকে তোর শেষ পর্য্যন্ত শুনতে বলিস্। যাত্রা ভাঙলে আমি ডেকে নিয়ে যাবো।'

হারু ঘাড় নাড়িয়া, 'হ্যাঁ' বলিয়া চলিয়া গেল।

*

*   *

দোতলার যে-ঘরে নারায়ণ থাকে, সুকুমারী সেই ঘরের মেঝেয় তাহার মেয়েটাকে ঘুম পাড়াইয়া নিজেও চুপ করিয়া শুইয়াছিল। ঘুম তাহার চোখে সেদিন কিছুতেই আসিতে-ছিল না। শুধুই তাহার মনে হইতেছিল, আজ সমস্ত গ্রামের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা আনন্দে মাতিয়াছে, শঙ্কর থাকিলে

সে-ও আজ তাহাদের সঙ্গে হাসিয়া-খেলিয়া আনন্দ করিত। কিন্তু আজ সে হয়তো কোন্ অপরিচিত স্থানে একটুখানি আশ্রয়ের জন্য ছুটিয়া বেড়াইতেছে। মাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া তাহার দিন কাটিতেছে কে জানে।

ঘরের দরজাটা সুকুমারী বন্ধ করে নাই। না জানি কখন্ যাত্রা ভাঙিবে, দরজা বন্ধ থাকিলে ইন্দুর ডাক যদি সে শুনিতে না পায় তাহা হইলে দরজার বাহিরে তাহাদের হয়তো অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে।

লণ্ঠনের আলোটা সে কম করিয়া দিয়া শিয়রের কাছে নামাইয়া রাখিয়াছে···ডাকিবামাত্র হাত বাড়াইয়া আলোটা লইয়া সে নীচে গিয়া তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দিবে।

দরজার কাছে কাশির শব্দ পাইয়া সুকুমারী হঠাৎ একেবারে আচম্‌কা চমকিয়া উঠিয়াই ফিরিয়া তাকাইল। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল,—'কে ?'

বলিয়াই সে হাত বাড়াইয়া লণ্ঠনের আলোটা উস্‌কাইয়া দিতেই দেখিল,—নারায়ণ।

সুকুমারী বলিল, 'সর্ব্বনাশ! আমি তো ভয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু দাদা, তুমি এলে কেমন করে' ? বাইরের দরজায় তো আমি খিল বন্ধ করে' এসেছি।'

নারায়ণ বলিল, 'খিল আমি বাইরে থেকে খুলতে পারি।— এক গ্লাস জল দে দেখি সুকুমারী, ভয়ানক পিপাসা পেয়েছে তাই চলে' এলাম। তুই গেলি না যে যাত্রা শুনতে ?'

সুকুমারী জল দিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'না দাদা, ছেলেটার জন্যে আমার চব্বিশ-ঘণ্টা কান্না পাচ্ছে। ওখানে গিয়ে পরের ছেলেদের দেখবো, আর আমার বুকের ভেতরটা হু-হু করে' উঠবে, তার চেয়ে না যাওয়াই ভাল।'

এই বলিয়া সে পাশের ঘর হইতে জল গড়াইয়া আনিবার জন্য লণ্ঠনটা হাতে লইয়া চলিয়া গেল।

লণ্ঠনটা নামাইয়া রাখিয়া কুঁজো হইতে জল গড়াইতেছিল সুকুমারী। হঠাৎ তাহার মনে হইল, কে যেন তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মানুষটি যে কে—সুকুমারী তাহা বুঝিল এবং বুঝিবামাত্র পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত তাহার ঝিম্-ঝিম্ করিতে লাগিল।

ঠক্ করিয়া জলের গ্লাসটা নামাইয়া দিয়া মুখ ফিরাইতেই দেখিল, নারায়ণ দাঁড়াইয়া আছে। দাঁড়াইয়া আছে পথ আগলাইয়া দোরের ঠিক মাঝখানে। ছুটিয়া বাহিরে যাইবার উপায় নাই।

নারায়ণ বলিল, 'সুকুমারী!'

সুকুমারী বলিল, 'পথ ছাড়ো।'

নারায়ণ আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া আরও কি যেন বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সুকুমারী তাহাকে সে অবসর দিল না, তাহাকে একরকম ঠেলিয়া দিয়াই সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

নারায়ণ বলিল, 'শোনো সুকুমারী, শোনো! আমার কথাটা—'

হড়াম্ করিয়া দরজা বন্ধের আওয়াজ হইল। সুকুমারী তখন পাশের ঘরে ঢুকিয়া ভিতর হইতে খিল বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

যাত্রাগান শেষ যখন হইল, রাত্রির অন্ধকার কাটিয়া তখন চারিদিক ফরসা হইতেছে। হারু, ইন্দু ও নারায়ণ তিনজনেই বাড়ী ফিরিল একসঙ্গে। সদর দরজার তালা খুলিয়া সুকুমারীকে ডাকিবামাত্র সে তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল।

সুকুমারী বোধকরি জাগিয়াই ছিল।

ইন্দু তাহার মুখের পানে একবার তাকাইল। দেখিল, সুকুমারীর চোখ দুইটা লাল, মুখখানি শুক্‌নো। বলিল, 'কেঁদেছো তুমি সারারাত? ঘুমোওনি, না? আহা, কি সুন্দর যাত্রা ভাই, আজ আবার হবে। আজ কিন্তু তোমায় আমি নিশ্চয়ই নিয়ে যাবো।'

কিন্তু এতগুলা কথা যে ইন্দু বলিল, সুকুমারী তাহার না দিল জবাব, না তুলিল মুখ। হেঁটমুখে যেমন সে আসিয়াছিল, আবার তেমনি হেঁটমুখেই সে চলিয়া গেল।

আজ শুভদিন

চা আজকাল ইন্দু নিজেই তৈরি করে। সেদিনও সে আসিয়াই কাপড় ছাড়িয়া উনান্ ধরাইয়া চা করিতে বসিল।

চা খাওয়া শেষ হইয়া গেলেই সুকুমারীকে ডাকিবে ভাবিয়া ইন্দু চুপ করিয়া বসিয়াছিল, হারু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'সুকুদি কোথায় গেল বৌদি?'

ইন্দু বলিল, 'কোথায় গেল তা আমি কেমন করে' জানবো। বাড়ীতেই আছে, যাবে আবার কোথায়!'

হারু বলিল, 'না না, তা বলিনি বৌদি, সুকুদি তার মেয়েটাকে কোলে নিয়ে বাইরে কোথায় বেরিয়ে গেল, তাই জিজ্ঞেস করছিলাম। ডাকলাম তো সাড়া দিলে না।'

ইন্দু বলিল, 'তা, গেল হয়তো ওর বৌদিদির বাড়ী।'

—'তাই হবে।'—বলিয়া চায়ের বাটিটা সেইখানে নামাইয়া দিয়া হারু চলিয়া গেল।

হারু মিথ্যা বলে নাই। সুকুমারী সেই যে কাহাকেও কিছু না বলিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল, আর ফিরিল না।

হারু বলিল, 'তখন তোমায় বললাম যে বৌদিদি! ডাকলাম তবু সাড়া দিলে না।'

ইন্দু বলিল, 'একবার দেখে এসো তো ভাই, ওর বৌদির কাছে গেছে কি না।'

হারু তৎক্ষণাৎ কুমুর কাছে ছুটিয়া গেল। দেখিল, সদ্য স্নান করিয়া একপিঠ চুল মেলিয়া কুমু তখন রান্না করিতে বসিয়াছে। হারু জিজ্ঞাসা করিল, 'সুকুদি আসেনি?'

কুমু বলিল, 'সে তো ভাই তোমাদের বাড়ীতেই রয়েছে শুনছি। এখানে আবার কিজন্যে আসবে?'

—'আসেনি তাহ'লে?'

ঘাড় নাড়িয়া কুমু বলিল, 'না ভাই, আসেনি। এলে কি আমি তাকে লুকিয়ে রাখবো?'

হারু চলিয়া যাইতেছিল, কুমু তাহাকে আবার ফিরিয়া ডাকিল। বলিল, 'আজ ক-দিন ধরেই তার একখানা চিঠি এসে পড়ে' আছে ভাই, দিয়ে আসি, দিয়ে আসি করে' আর আমার যাওয়া হয়নি। চিঠিখানা নিয়ে যাও তো হারু!'

এই বলিয়া মাথার উপরের খড়ের চালাটা দেখাইয়া দিয়া কুমু বলিল, 'ওইখানে কোথায় গোঁজা আছে, হাত বাড়িয়ে পেড়ে নাও।'

অনেক কষ্টে অনেক খোঁজাখুঁজির পর খড়ের ভিতর হইতে হারু একখানি পোষ্টকার্ডের চিঠি টানিয়া বাহির করিল এবং ভাঁজকরা সেই চিঠিখানি চোখের সুমুখে খুলিয়া ধরিতেই দেখিল—যাহার জন্য সুকুমারী একেবারে পাগল হইতে বসিয়াছে, এ তাহার সেই হারাণো-ছেলে শঙ্করের চিঠি।

বড় বড় অক্ষরে মেয়েলী-হাতের লেখায় কাহাকে দিয়া চিঠিখানি সে যেন লিখিয়াছে বলিয়া মনে হইল। দেখিল সে লিখিতেছে :

মা,

তুমি আমার জন্য ভাবিও না। আমি বেশ ভাল আছি।
আমি কিজন্য যে তোমাকে ছাড়িয়া আসিয়াছি, পরে
তাহা বুঝিতে পারিবে। আমি বেশ সুখে আছি।
এখানে বাবা ও (মা লিখিয়া আবার কাটিয়া
দিয়াছে) আমাকে খুব ভালবাসে। ইতি

আমার ঠিকানা— তোমারই—
পরেশগঞ্জ, বিজয়বাবুর বাড়ী। শঙ্কর

চিঠিখানি পাইয়া সে ঊর্দ্ধশ্বাসে বাড়ী ফিরিল—সংবাদটা সুকুমারীকে দিবার জন্য। কিন্তু বাড়ী ফিরিয়া দেখিল, সুকুমারী তখনও ফিরে নাই।

হারু জিজ্ঞাসা করিল, 'দাদা, তুমি আজ কাজে বেরোবে নাকি ?'

নারায়ণ বলিল, 'কেন বল্ দেখি ?'

হারু বলিল, 'তোমার বাইক্‌টা নিয়ে তাহ'লে একবার সুকুদিকে খুঁজে আসতাম।'

নারায়ণ বলিল, 'যা।'

বাইক্‌টা লইয়া হারু তৎক্ষণাৎ সুকুমারীর সন্ধানে ছুটিল।

ফিরিয়া যখন আসিল, বেলা তখন বারোটা। আর-এক দিন সে ঠিক এমনি করিয়াই ছুটিয়াছিল—শঙ্করের সন্ধানে। সেদিনও যেমন সে বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল, আজও তেমনি ফিরিয়া আসিল শুক্‌নো-মুখে। সুকুমারীর সন্ধান কোথাও মিলিল না।

ইন্দুর হঠাৎ কি যেন মনে হইল। নারায়ণের কাছে গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, 'হ্যাঁগা, তুমি জানো কিছু?'

কিছুই যেন জানে না এমনি ভাব করিয়া নারায়ণ বলিল, 'কি? কিসের? কি জানতে হবে?'

বলিয়া নিতান্ত বোকার মত হাঁ করিয়া সে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

ইন্দু বলিল, 'জিজ্ঞাসা করছি, সুকুমারীর কথা। কোথায় গেল কিছু জানো? সেই যে সকালে বেরিয়ে গেছে, এখনও এলো না। তাই যাবি তো—বলেই যা না রে বাপু!'

নারায়ণ বলিল, 'কই, না, আমায় তো কিছু বলে' যায়নি। আর আমার সঙ্গে দেখাই-বা হলো কখন্ যে বলবে!'

ইন্দু বলিল, 'কি জানি বাবা, আগুনের মতন রূপ নিয়ে ওই সোমত্ত বিধবা মেয়ে…'

নারায়ণ চুপ করিয়া রহিল।

আজ শুভদিনে

*

* *

শঙ্করীকে কোলে লইয়া একেবারে নিরাশ্রয় নিরালম্ব অবস্থায় কাঁদিতে কাঁদিতে সুকুমারী পথে আসিয়া দাঁড়াইল। যত দুঃখ, যত কষ্টই হোক্—এরকম গৃহের আশ্রয় আর সে চায় না। নিজের দেহ দিয়া, সতীত্ব দিয়া, সর্ব্বস্ব দিয়া যদি তাহাকে দু'বেলা দু-মুঠা আহারের সংস্থান করিতে হয় তো চাই না তাহার আহার, চাই না তাহার আশ্রয়, কোলের এই মেয়েটাকে কাহাকেও দান করিয়া দিয়া—নিজে সে আত্মহত্যা করিবে, বরং সেও ভাল। সুকুমারী শুনিয়াছে নাকি অন্নপূর্ণার রাজত্ব পুণ্যতীর্থ বারাণসীধামে গেলে মানুষের সকল জ্বালা জুড়াইয়া যায়। যেমন করিয়াই হোক্, এবার সে সেইখানেই যাইবে।

এমনই সব নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে সুকুমারী আগাইয়া চলিল। তাহাদের গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া, মাঠ, ঘাট, প্রান্তর পার হইয়া যখন সে রেল-ষ্টেশনে গিয়া পৌঁছিল, বেলা তখন প্রায় বারোটা। এমনি একটা রেল-ষ্টেশনে আজীবন ভিক্ষা করিয়া স্বামী তাহার দিন কাটাইয়াছে, আজও হয়তো তাহার সেই ভিক্ষা ছাড়া আর উপায় নাই। পথের ধারের একটা পুকুরে নামিয়া শঙ্করীকে সে খানিকটা জল খাওয়াইয়া আসিয়াছে, তাহার পর এই এত বেলা পর্য্যন্ত এখনও সে

উপবাসী। কেমন করিয়া কি যে সে করিবে কে জানে! শঙ্করের মুখে একদিন সে এই ভিক্ষার কথা শুনিয়া তাহাকে তিরস্কার করিয়াছিল। আজ কিন্তু এই মেয়েটার জন্য শেষ পর্য্যন্ত হয়তো ভিক্ষাই তাহাকে করিতে হইবে।

করিতে হইলও তাই।

শঙ্করী বার-বার তাহাকে প্রশ্ন করিতেছিল, 'মা, তুমি কোথায় চললে? ওখান থেকে চলে' এলে কেন মা?'

এ প্রশ্নের কোনও জবাবই সে খুঁজিয়া পাইল না। প্রথম প্রথম অন্যমনস্কের মত 'হ্যাঁ, হ্যাঁ' বলিয়া তাহাকে চুপ করাইবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহাতেও তাহার কৌতূহলী শিশু-চিত্তকে শান্ত করিতে না পারিয়া বলিয়াছে, 'তোমার দাদাকে খুঁজতে বেরিয়েছি মা। শুনলাম সে কাশীতে আছে।'

খাইবার কথা শঙ্করী অনেকক্ষণ বলে নাই। পথে একটা ভাল পুকুর দেখিয়া পিপাসার কথা একবার সে বলিয়াছিল মাত্র। তাহার পর এই এতক্ষণ পরে রেল-ষ্টেশনের ফেরি-ওয়ালার মাথায় নানারকমের খাবার দেখিয়া মনটা তাহার চঞ্চল হইয়া উঠিল। বারে-বারে সতৃষ্ণ নয়নে সেইদিকে তাকাইতে তাকাইতে হঠাৎ একসময় বলিয়া উঠিল—'বাড়ী থেকে আসবার সময় কতকগুলো মুড়ি তুমি আঁচলে বেঁধে নিলে না কেন মা? এইসময় তাহ'লে আমরা দু-জনে খেতাম।'

আর বেশি কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। ক্ষুধায় সে যে সত্যই কাতর হইয়া পড়িয়াছে, সুকুমারী তাহা বুঝিতে পারিল। এবং বুঝিতে পারিয়াই বোধকরি জবাব দিল, 'মুড়ি?—হ্যাঁ, তা আনলে হতো, কিন্তু তার আর সময় পেলাম কই মা!'

এই বলিয়া সে উন্মাদিনীর মত একবার এখানে দাঁড়াইল, একবার ওখানে দাঁড়াইল, ষ্টেশনের বারান্দার একপাশে বাক্স-প্যাট্‌রা মোট-পুঁটুলি লইয়া জনতিনেক আধবয়েসী মেয়ে বসিয়া বসিয়া বোধকরি ট্রেণের অপেক্ষা করিতেছিল। সুকুমারী তাহাদের কাছে গিয়া চুপ করিয়া বসিল। একবার ভাবিল—ইহাদের সঙ্গে যাচিয়া আলাপ করিলে কেমন হয়! কথায় কথায় তাহার দুঃখের কাহিনীটা একবার যদি সে তাহাদের শুনাইতে পারে তো আর-কিছু না হোক্, শঙ্করীকে তাহারা দয়া করিয়া কিছু খাইতে দিবে। কিন্তু এখনও—এই এত দুঃখ-দুর্দ্দশার মধ্যেও লজ্জায় সে মুখ ফুটিয়া একটি কথাও বলিতে পারিল না। দেখিতে দেখিতে তাহাদের ট্রেণ আসিল। কুলির মাথায় লট-বহর তুলিয়া দিয়া তাহারা উঠিয়া গেল। আর সুকুমারী তখনও সেইখানে মুখ বুজিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

কিন্তু এমন করিয়া আর কতক্ষণ থাকিবে? মুখ ফুটিয়া কাহাকেও কিছু না বলিলে, লোকেই-বা বুঝিবে কেমন করিয়া! সুকুমারী ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। শঙ্করী দূরে একটা

'ডিস্‌টেণ্ট সিগনাল'-এর দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া ছিল। হাত বাড়াইয়া তাহাকে কাছে ডাকিয়া সুকুমারী বলিল, 'আয়।'

ছোট ষ্টেশন। কিছুদূরে ফাঁকা একটা মাঠের মাঝখানে লালরঙের ইঁটের তৈরি খান-দুই ছোট ছোট বাড়ী। উহাই বোধকরি ষ্টেশন-মাষ্টারের কোয়াটার। সুকুমারী দেখিল, সেই কোয়াটারের একটি ঘরে একটি জানলার শিক ধরিয়া একটি মেয়ে দাঁড়াইয়া আছে।

শঙ্করীকে তাহার পিছু পিছু আসিতে বলিয়া সুকুমারী সেই দিকে আগাইয়া চলিল।

কাছে যাইতেই দেখিল, তাহার অনুমান মিথ্যা নয়। ষোলো-সতেরো বছরের যুবতী একটি মেয়ে জানলার পাশে দাঁড়াইয়া আছে।

সুকুমারী কথা কহিবার আগেই মেয়েটি কথা বলিল।

জিজ্ঞাসা করিল, 'কাকে চান?'

সুকুমারী তাহার মুখের পানে তাকাইয়া সেদিক হইতে যেন আর চোখ ফিরাইতে পারিল না। লক্ষ্মী-প্রতিমার মত চেহারা, ঢল্‌ঢলে দুটি আয়ত সুন্দর চোখ, সাদা ধবধবে গায়ের রং, পরনে চওড়াপাড় শাড়ী, দু-হাতে দুগাছি মাত্র সোনার চুড়ি। কিন্তু গায়ের রং যেন সে চুড়ির রংকেও হার মানাইয়াছে।

সুকুমারী মুখে কিছুই বলিতে পারিল না। একদৃষ্টে

মেয়েটির মুখের পানে তাকাইতে গিয়া চোখ দুইটি তাহার সজল হইয়া আসিল।

মেয়েটি তাহার সেই সুকোমল সুন্দর একখানি হাত বাড়াইয়া বলিল, 'ওইদিকে আমাদের দরজা, আমি খুলে দিচ্ছি, আপনি ভেতরে আসুন।'

সুকুমারী ও শঙ্করী দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই ভিতর হইতে দরজা খোলার শব্দ হইল। তাহার পর দেখা গেল, মেয়েটি নিজে আসিয়া দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়াছে।

পরিচয় হইতে বেশি দেরি হইল না। মেয়েটি এখানকার ষ্টেশন-মাষ্টারের গৃহিণী। নাম তুলসী। সবে গত বৎসর তাহার বিবাহ হইয়াছে।

আর সুকুমারী নিজের পরিচয় দিল এই বলিয়া যে, সে পথের ভিখারিণী। আপনার বলিতে ত্রিসংসারে তাহার আর কেহ নাই। সাত-আট বছরের বড় ছেলেটি তাহার হারাইয়া গিয়াছে, এখন এই মেয়েটিকে লইয়া সে পথে দাঁড়াইয়াছে। কোথায় যাইবে, কি করিবে, কিছুই সে জানে না। সম্প্রতি এই মেয়েটাকে যাহোক্ কিছু চারটি খাওয়াইতে চায়। আর কিছু সে চায় না।

তুলসী তাড়াতাড়ি তাহার পাশের ঘরে গিয়া একটা টিন-ভর্ত্তি মুড়ি, খানিকটা দুধ আর কিছু মিষ্টি লইয়া আসিল। বলিল, 'এ-ই আজ আপনাদের খেতে হবে। আর তো কিছু এখানে পাওয়া যায় না।'

এই বলিয়া তাহাদের দুই মা-ও-মেয়েকে খাইতে দিয়া তুলসী গল্প করিতে বসিল। 'এখান থেকে আমরা বোধহয় দু-একদিনের ভেতরেই বদলী হয়ে চলে' যাবো।'

—'কেন?'

—'এ জায়গাটা ভারি খারাপ। কারও সঙ্গে বসে' বসে' যে দুটো কথা কইবো তার উপায় নেই।' এই বলিয়া একটু থামিয়া সে আবার বলিল, 'দিন-রাত এই জানলার ধারে চুপ করে' দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার সময় আর কাটে না ভাই!'

বলিয়া সে তাহার আরক্তিম ওষ্ঠপ্রান্ত বিকশিত করিয়া একটুখানি হাসিল। মুক্তার মত সুবিন্যস্ত কয়েকটি দাঁত দেখা গেল। যেমন সুন্দর মুখখানি তাহার, তেমনি সুন্দর হাসি।

সুকুমারী জিজ্ঞাসা করিল, 'ছেলেপুলে কিছুই হয়নি, না?'

লজ্জায় তুলসী মাথা হেঁট করিয়া আবার ঈষৎ হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না।'

তাহার পর খাওয়া শেষ হইলে তুলসী জিজ্ঞাসা করিল, 'তাহ'লে আপনি কি করবেন? আমিও বড় গরীবের মেয়ে। মানুষের কষ্ট দেখলে আমার বড় কষ্ট হয়।'

সুকুমারী বলিল, 'আমাকে 'আপনি' বোলো না ভাই, আমাকে 'তুমি' বোলো।—কি করবো জিজ্ঞেস্ করছো? কিছুই তো জানিনে ভাই! এই দুটি খেতে দিলে, খেলাম। এইবার

এই মেয়েটাকে নিয়ে যেদিকে দু-চোখ যায় সেইদিকে চলে' যাবো।'

বলিতে বলিতে সে ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

তুলসী তাহার মুখের পানে ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করিয়া তাকাইয়া রহিল। সুকুমারীর কান্নার বেগ একটুখানি থামিলে সে ধীরে ধীরে বলিল, 'একটা কথা বলতে আমার লজ্জা করছে ভাই, বলবো ?'

সুকুমারী বলিল, 'আমার কাছে আবার লজ্জা কিসের ভাই ?'

তুলসী বলিল, 'উনি বলেছিলেন, বামুনের একটি মেয়ে যদি পান তো তাকে আমার কাছে রেখে দেবেন। রান্না-বান্না করে' দেবে, আমার কাজ-কর্ম্ম করে' দেবে, আর তাছাড়া আমি এখানে একলা থাকি কিনা—'

কথাটা সুকুমারী প্রথমে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। তাহা হইলে, ভগবান কি এমনি করিয়াই তাহাকে আশ্রয় দিবেন ? খানিক পরে, খানিক ভাবিয়া ঘাড় নাড়িয়া সুকুমারী বলিল, 'আমি থাকবো।'

তুলসী বলিল, 'আমরা কিন্তু এখান থেকে শীগগির্‌ই বদ্‌লি হয়ে যাবো।'

—'ভালই তো। আমাকেও সেইখানে নিয়ে যেয়ো।'

—'হ্যাঁ, তা তো যাবোই।—দাঁড়াও, উনি এলেই ওঁকে বলবো। আমার মনে হয়, আপত্তি বোধহয় করবেন না।'

সুকুমারী বলিল, 'আচ্ছা ভাই, তোমরা তো দু-জন লোক, কাজকর্ম্ম তো একরকম নেই বললেই হয়। লোক কিজন্যে রাখবে?'

তুলসী বলিল, 'আমি রাখতে চাইনি ভাই, উনিই চেয়েছেন।'

—'কিন্তু মিছিমিছি খরচ তো।'

—'যার খরচ তার খরচ, তাতে তোমারই-বা কি আর আমারই-বা কি।'

বলিয়া তুলসী মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

এ আবার কিরকম কথা!

সুকুমারী একটুখানি অবাক্ হইয়া মেয়েটির মুখের পানে তাকাইয়া রহিল। মেয়েটি দেখিতেও যেমন অসাধারণ, কথা-বার্ত্তার ধরণ-ধারণও তেমনি কেমন যেন একটু কেমন-কেমন।

সে যাই হোক্, তুলসীকে তাহার মন্দ লাগিল না। কিন্তু গত রাত্রে নারায়ণের ব্যবহারটা এখনও তাহার মন হইতে মুছিয়া যায় নাই। সেই নারায়ণ! ছেলেবেলা হইতে যাহাকে সে দাদা বলিয়া ডাকে। যাহাকে দেখিয়া এই সেদিন পর্য্যন্ত তাহার মনে হইয়াছে—'নারাণদা বুঝি গতজন্মে আমার ভাই ছিল।'...সেই নারায়ণ!

মানুষের দুর্ব্বলতা কখন্ যে কেমন করিয়া প্রকাশ পায়, সহজে হয়তো সে নিজেই তা বুঝিতে পারে না।

বাড়ীতে তৃতীয় ব্যক্তি নাই। তুলসী আর তাহার স্বামী। আর এই রেল-ষ্টেশনের ফাঁকা তেপান্তরের মাঠ!...চীৎকার করিয়া গলা ফাটাইয়া দিলেও কেহ শুনিতে পাইবে না, গুম্-খুন করিয়া দিলেও কাহারও টের পাইবার উপায় নাই।

সুকুমারী বলিল, 'আচ্ছা ভাই, তোমাদের এই তেপান্তরের মাঠে একা-একা থাকতে ভয় করে না?'

—'ভয়?'—তুলসী আবার হাসিল। বলিল, 'তবে আর তোমাকে রাখতে চাইছি কেন। এধারে আছে লুনিয়া-খালাসীর বৌ আর ওই-যে—ওই একটা ছোট্ট ঘর দেখতে পাচ্ছো, ওখানে থাকে ইয়াসিন্ মিস্ত্রী। ও-মিন্ষের বৌ-টৌ নেই। হতভাগা এমনি পাজি, মাঝে মাঝে কোত্থেকে একটা করে' বাউরি-বাগদির মেয়ে ধরে' আনে, মাসখানেক হয়তো বৌএর মত রাখে, তারপর মার-ধোর করে' দেয় তাড়িয়ে। এই সেদিনে একটাকে তাড়িয়েছে ভাই। মা-গো মা, রাত্তিরবেলা মেয়েটার সে কি কান্না! সারারাত ভাই আমার ঘুম হয়নি।'

সুকুমারী ভাবিল, কাজ নাই, এখানে তাহার না থাকাই উচিত। পথ চলিতে চলিতে একবার সে কাশী যাইবার কথা ভাবিয়াছিল। অবশ্য কাশী সে জীবনে কখনও দেখে নাই, কিন্তু শুনিয়াছে নাকি কাশী অতি চমৎকার জায়গা। অন্নপূর্ণার রাজত্ব, অন্নের অভাব সেখানে নাই। তাহা ছাড়া তাহার মত পাপী-তাপী অনাথা আশ্রয়হীনারা বাবা-বিশ্বনাথের চরণ-

প্রান্তে নিরাপদ আশ্রয় আর মনের শান্তি না-কি আপনা হইতেই খুঁজিয়া পায়।

সুকুমারীর স্বামী ছিল ভিখারী। শেষ-জীবনে ভিক্ষাই ছিল তাহার একমাত্র উপজীবিকা। আর বিপদে-আপদে সুখে-দুঃখে মুখে ছিল তাহার একটিমাত্র কথা—'জয় বাবা কাশীনাথ! জয় বাবা বিশ্বেশ্বর!' কখনও-বা হাসিয়া হাসিয়া বলিত, 'ভিখারী ভোলানাথকেও লোকে বিশ্বেশ্বর বলে গো! আমি ভিক্ষে করি বলে' তোমরা আমায় ঘৃণা কোরো না।—বুঝলে?'

সুকুমারীর লজ্জা হইত। বলিত, 'ভিখিরী-ভিখিরী কোরো না বাপু, চুপ করো।'

স্বামী তাহার কাশীর গল্প সুরু করিত। জীবনে কাশী সে বহুবার গিয়াছিল। বলিত, 'ছ্যাখো, যেদিন বুঝবো এখানে আর আমাদের চলছে না,—তোমার কষ্ট হচ্ছে, সেই দিনই আমরা সবাই মিলে কাশী চলে' যাবো। নিজেও ভিখিরী, আর ওই বাবা-বিশ্বনাথও ভিখিরী। অন্নপুন্নোর দরজায় তার অন্ন যখন মেলে, তখন আমারও মিলবে।'

কিন্তু সে দুর্দ্দিনের জন্য তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইল না। হঠাৎ একদিন সব-কিছু ফেলিয়া-ছড়াইয়া দিয়া সে চলিয়া গেল।

আজ সেই দুর্দ্দিন আসিয়াছে। কিন্তু সে একা। সেইজন্য আজ প্রথমেই তাহার মনে পড়িল—কাশীর কথা।

তুলসীর সঙ্গে বসিয়া বসিয়া গল্প করিতে করিতে সুকুমারী

হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। জানলার বাহিরে চক্‌চকে দুটো মোটা-মোটা সাপের মত রেলের লাইন পাতা। উহারই উপর দিয়া ট্রেণে চড়িয়া কাশী যাইতে হয়। সুকুমারী সেইদিকপানে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা, এখান থেকে কাশী কতদূর ভাই? আমার মতন মেয়েরা একা যেতে পারে না?'

তুলসী বলিল, 'আমাদের ভাই সে সুখ আছে যথেষ্ট। কাশী আমরা গিয়েছিলাম যে। এ-বচ্ছর আবার যাবো।'

সুকুমারী জিজ্ঞাসা করিল, 'এখান থেকে ভাড়া কত?'

তুলসী এবার ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, 'ভাড়া কি গো! ভাড়া কি আমাদের লাগে নাকি? উনি যে ইষ্টিশান-মাষ্টার!'

সুকুমারী বলিল, 'উনি যদি বলে' দেন, তাহ'লে অমনি যাওয়া যায় না?'

তুলসী বলিল, 'হ্যাঁ, তা যায় বই-কি!'

সুকুমারী আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিল না। তখনি জানলার কাছ হইতে তুলসীর কাছে আগাইয়া আসিয়াই তাহার সেই সুন্দর হাত দুইখানি চাপিয়া ধরিল। বলিল, 'তোমার এই হাতে ধরে' বলছি ভাই, আমার একটি উপকার তুমি করো। তোমার স্বামীকে বলে-কয়ে' কোনোরকমে আমাদের এই মা আর মেয়েকে তুমি কাশী পাঠিয়ে দাও। আমরা চলে' যাই এখান থেকে।'

তুলসী বলিল, 'কেন? এই যে বললে এখানে থাকবে? থাকো না ভাই। কাশী—আমাদের সঙ্গে যাবে, আবার আমাদের সঙ্গেই ফিরে আসবে।'

সুকুমারী বলিল, 'না ভাই, কোথাও আর কারও বাড়ীতে থাকবো না ভেবেছি।'

তুলসী চুপ করিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল।

সুকুমারী জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার বরের ছুটি কখন্?—কখন্ আসবেন এখানে?'

তুলসী বলিল, 'এই তো এইবার ছোটবাবু যাবেন, আর উনি আসবেন।'

—'এখানে আবার ছোটবাবু আছে নাকি?'

—'হ্যাঁ, ওই যে কোয়াটার।' বলিয়া জানলার বাহিরে আঙুল বাড়াইয়া তুলসী একখানি ঘর দেখাইয়া দিল।

—'ওর ছেলেমেয়ে নেই?'

তুলসী আবার হাসিল। বলিল, 'ওই আবার আর-এক হতভাগা। বৌ আছে না!—কালোমতন বৌ একটা আছে। একদিন এসেছিল আমার কাছে। শোনো তবে দিদি, ওর কথা জিজ্ঞাসাই করলে যদি তো ওর গুণের কথা বলি। একদিন হয়েছে কি, জ্যোৎস্না রাত, চারদিকে চাঁদের আলো একেবারে ধবধব করছে। উনি গেছেন ইষ্টিশানে, আমি একা এই বাসায়। ঘুম কিছুতেই আসছে না—ওই জানলার ধারে গিয়ে চুপ করে' দাঁড়িয়ে আছি। এমন সময় টুপি

মাথায় দিয়ে জুতো মস্‌মস্‌ করতে করতে ওই মুখপোড়া এসে দাঁড়ালো এই জানলার বাইরে—ওইখানে। দাঁড়িয়ে বললে, 'বৌদিদি, পেন্নাম। এক গ্লাস জল দিতে পারেন? দারুণ পিপাসা।' ওর কাছে আমি কোনোদিন বেরোই না, কথাও কই না। লজ্জায় মাথার কাপড়টা একটু টেনে দিয়ে একটুখানি সরে' দাঁড়ালাম। হতভাগা এগিয়ে একেবারে এই জানলার পাশে এসে দাঁড়ালো। আবার বললে, 'পিপাসার্ত্তকে জল দিলে পুণ্যি হয় বৌদি। আপনার উনি কিছু বলবেন না। দিন।' আমি ভাই কি আর কবি, ভাবলাম—সত্যিই হয়তো পিপাসা পেয়েছে, ভদ্রলোক এক গ্লাস জল চাইলে, কেমন করেই-বা না দিই। জল গড়িয়ে এনে ওই শিকের ভেতর দিয়ে হাত গলিয়ে গ্লাসসুদ্ধু জল আমি ওইদিকে নামিয়ে দিলাম। হতভাগা তখন বলে কিনা—'আমি কি জন্তু-জানোয়ার নাকি বৌদি? এমন অবহেলা করে' দেওয়া জল আমি খাই না।' বলে' গ্লাসের জলটা সে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হাসতে হাসতে চলে' গেল। ভাবলাম—লোকটা হয়তো পাগল। উনি এলে কথাটা ওঁকে বললাম। উনি তো আমারই দোষ দিতে লাগলেন। বললেন, 'জল তুমি ওকে দিলে কেন? হতভাগা মদ খায়।' তার পরদিনই উনি বদ্‌লির দরখাস্ত করেছেন। আর—ভাল-জাতের মেয়ে একটি আমার কাছে রেখে দেবেন বলেছেন। কিন্তু মেয়ে ভাই কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না, তাই আমি তোমাকে এত করে' বলছি।

এলে যদি দয়া করে' তো থাকো না ভাই আমার কাছে। সত্যি বলছি—আমার বড় ভয় করে।'।

সুকুমারী চুপ করিয়া সবই শুনিল। কি যেন বলিতেও যাইতেছিল, এমন সময় ঘরের বাহিরে জুতার শব্দ হইল।

—'উনি এসেছেন' বলিয়া তুলসী ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, আর সুকুমারী চলিয়া গেল পাশের ঘরে। শঙ্করী হতভম্বের মত চৌকাঠের কাছে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

উনি আসিলেন। দরজার ফাঁকে উঁকি মারিয়া সুকুমারী তাঁহাকে একবার দেখিল। সর্ব্বনাশ! ইনিই কি তুলসীর 'উনি' নাকি? স্পষ্ট দিবালোকে যাহা সে দেখিল, তাহা ভুল নয়। কালো কিম্ভূতকিমাকার লম্বা চেহারা। এত লম্বা যে, চলিবার সময় খানিক্‌টা কুঁজো হইয়া চলিতে হয়। মাথার চুল পাকিয়া গেছে, মুখে দাঁত বোধকরি একটিও নাই। তুলসীর পিতামহের বয়েসী।

তুলসীর কথাবার্ত্তা শুনিয়া মনে হইতেছিল—ইনিই তাহার স্বামী, কিন্তু তুলসীর সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্য্যন্ত বিশ্বাস করা শক্ত।

খানিক পরে তুলসী নিজেই এ-ঘরে আসিল। বলিল, 'চলো ভাই সুকুমারী, ও-ঘরে চলো। উনি ডাকছেন।'

তাহা হইলে অনুমান তাহার সত্য। এই বৃদ্ধই তাহার স্বামী।

সুকুমারী বলিল, 'আমি আর কিজন্যে যাবো? নাই-বা গেলাম।'

তুলসী বলিল, 'না, তুমি এসো! আমার কথা সে বিশ্বেস করে না।'

এই বলিয়া সুকুমারীকে একরকম টানিতে-টানিতেই তুলসী তাহার স্বামীর কাছে আনিয়া দাঁড় করাইয়া দিল।

সুকুমারী আর-একবার তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখিল। দেখিল, তুলসীর স্বামী হইবার যোগ্যতা তাহার একফোঁটাও নাই।

তুলসী সুকুমারীর কাছেই দাঁড়াইয়াছিল, বলিল, 'এই ছাখো—এই এরই কথা বলছি। থাকতে ও কিছুতেই চাচ্ছে না। যে তোমার জায়গার ছিরি! এখানে আবার মানুষে থাকে!'

স্বামী তাহার চোখের চশমা কপালে তুলিয়া ততক্ষণ সুকুমারীকে বেশ ভাল করিয়া দেখিয়া লইতেছিলেন। গম্ভীর-মুখে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, 'হুঁ। খরচ তাহ'লে আবার কিছু বাড়লো।'

তুলসী বলিল, 'বেশ, তাহ'লে রেখো না গো। আমি তো আর বলিনি, তুমিই বলেছিলে। আমার ভারি বয়েই গেল।'

তিনি একবার মুখ তুলিয়া তুলসীর মুখের পানে কট্‌মট্ করিয়া তাকাইলেন। বলিলেন, 'হুঁ।' বলিয়াই সুকুমারীর দিকে তাকাইয়া বলিতে সুরু করিলেন, 'আমার ভারি বয়েই

গেল। শুনছো গো মেয়ে—কথাটার মানে বুঝতে পেরেছো? উঁ-হুঁ, এত তাড়াতাড়ি বুঝতে পারবে না। দু-চারদিন থাকো। থাকলেই বুঝবে।'

তুলসী বেশ একটু রুক্ষকণ্ঠেই বলিয়া উঠিল, 'আবার সেই কথা।'

ভদ্রলোক একটুখানি অপ্রতিভ হইয়া গেলেন। কি কথা যেন বলিতে গিয়াও তিনি আর বলিতে পারিলেন না। শুধু বলিলেন, 'বা-রে। সে-কথা বলছি নাকি? সে-কথা আমি আর বলি কোনোদিন?'

বলিয়াই কথাটাকে সম্ভবত পাল্‌টাইয়া দিবার জন্য সুকুমারীকে আর-একবার তিনি ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া বলিলেন, 'তোমার বাড়ী কোথায় গো মেয়ে? বাড়ীতে কে আছে তোমার?'

সুকুমারী কথা কহিবার আগেই তুলসী বলিয়া উঠিল, 'বাড়ী যেখানেই হোক্ না, তোমার কি? বাড়ীতে কে আছে জিজ্ঞাসা করছো? কেউ নেই। কেউ থাকলে কখনো এই বয়েসে বাড়ীর বার হতে দেয়?'

—'বেশ বেশ, তাহ'লে এখানে থাকবে তুমি?'

সুকুমারীর মনে প্রথমে যে আপত্তির প্রশ্ন জাগিয়াছিল, তুলসীর স্বামীকে দেখিয়া সে-কথা তাহার আর মনে হইল না। ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হ্যাঁ, থাকবো।'

—'ভাল। কিন্তু কি করতে হবে জানো তো?'

স্কুমারী জিজ্ঞাসা করিল, 'কি করতে হবে?'

তুলসী বলিল, 'সেও কি তুমি বলে' দেবে নাকি? সে-সব আমি ঠিক করে' নেবো।'

এই বলিয়া স্কুমারীর হাত ধরিয়া টানিয়া সে তাহাকে বাহিরে লইয়া যাইতেছিল, মাষ্টার-মশাই বলিলেন, 'আহা, তা না-হয় ঠিক করে' নিলে, কিন্তু আর-সব ওকে বলেছো তো? ···তোমার নাম কি গো মেয়ে? তোমায় কি বলে' ডাকবো?'

তুলসী বলিল, 'ওর নাম স্কুমারী। কিন্তু আর-সব কি কথা, শুনি?'

—'স্কুমারী। বেশ, বেশ। আর-সব কথা হচ্ছে, এই ধরো আমরা এখান থেকে বদ্‌লি হয়ে চলে' যাবো যখন, ওকেও যেতে হবে। তারপর ধরো, ফট্ করে' যখন-তখন তুমি যে বলবে, আমার ভাল লাগছে না, আমি বাড়ী যাবো, তা বললে চলবে না। বাড়ী পৌঁছে দেবার লোকজন আমার নেই।'

স্কুমারী বলিল, 'বাড়ী আমার নেই। বাড়ী যেতে আমি চাইবো না।'

মাষ্টার-মশাই এইবার তাঁহার গলাটা একবার পরিষ্কার করিয়া লইলেন। বলিলেন, 'কিন্তু হ্যাঁ, একটা কথা শুনে রাখো। তোমায় দেখে মনে হচ্ছে, বয়েস তোমার বেশি নয়, তাছাড়া চেহারাটাও নেহাত···তার ওপর বিধবা। তেমন-

তেমন যদি কিছু দেখি তো কিছু বাকি রাখবো না বলে' দিচ্ছি। ও-সব আমি ভালবাসি না। আর ওই আমার স্ত্রী থাকবে তোমার কাছে, বাড়ীতে আমার লোকজন কেউ নেই, বুঝেছো ?'

কথার মাঝখানেই তুলসী এবার বলিয়া উঠিল, 'থামো। আর কিছু বলতে হবে না, বুঝতে ও পেরেছে।'

—'মাইনের কথাটা কয়েছো তো ?'

তুলসী এইবার থমকিয়া দাঁড়াইল। সে-কথা সে বলে নাই। ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না।'

মাষ্টার-মশাই হাসিয়া উঠিলেন।—'বারে—বা! আসল কাজই বাকি। শেষে কাজ করবার পর আমি বলবো পাঁচ টাকা, আর ও বলবে দশ টাকা। ও-সব আমি ভালবাসি না বাপু, সাফ-রাফ হয়ে যাওয়াই ভাল।'

তুলসীকে সুকুমারী নিজের কাছে টানিয়া আনিয়া তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপিচুপি বলিল, 'মাইনে আমি চাইনে ভাই, খেতে-পরতে দিয়ো আর এই মেয়েটা বড় হলে' ওর একটা বিয়ে-থার ব্যবস্থা কোরো।'

তুলসী ম্লান একটুখানি হাসিল।

সুকুমারী জিজ্ঞাসা করিল, 'হাসলে যে ?'

তুলসী বলিল, 'ও মেয়ে তোমার বড় যখন হবে, তখন আমরা কেউ বেঁচে থাকবো কিনা কে জানে।—সেজন্যে ভেবো না তুমি, তার ব্যবস্থা হবে।'

মাষ্টার-মশাই ইহাদের কথাবার্ত্তা ভাল করিয়া কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, বলিলেন, 'মাইনের কথা হতে হতে আবার মেয়ের বিয়ের কথা উঠলো কেন?'

তুলসী বলিল, 'ওকে যা মাইনে দেবে সেই টাকা ও জমিয়ে জমিয়ে মেয়ের বিয়ে দেবে বলছে।'

—'তা সে যা-খুশি তাই করবে, আমাকে এখন কত করে' দিতে হবে তাই বলো।'

সুকুমারীকে কিছুই বলিতে হইল না। তুলসীই বলিয়া দিল। বলিল, 'খাওয়া-পরা বাদে মাসে পাঁচ টাকা করে' দিও।'

মাষ্টার-মশাই বলিলেন, 'পাঁচ টাকা! কিন্তু খাবে ওরা দু-জন! একরকম ধরতে গেলে—'

তুলসী আবার চীৎকার করিয়া উঠিল, 'তোমার এত ছোট নজর কেন বল তো! ছোট এই এতটুকু একটা মেয়ে··· যাও, তোমার সিগনাল্ হয়ে গেছে, তুমি ওঠো।'

মাষ্টার-মশাই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। জানলার বাহিরে একবার তাকাইয়া দেখিলেন, ডাউন ট্রেণখানার সিগনাল্ সত্যই হইয়াছে কি-না। তাহার পর ধীরে ধীরে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, 'রাত্রে আজ ওকে দিয়েই রান্নাবান্না করিও। কেমন রাঁধে দেখা যাবে।'

রাত্রে দেখা গেল সে চমৎকার রান্না করিয়াছে। মাষ্টার-

মশাই খুশী হইলেন। বলিলেন, 'ওগো ও তুলসীবালা, শোনো, শোনো!'

তুলসী কাছে আসিয়া হাসিয়া বলিল, 'এখন আর ও-রকম চীৎকার করে' ডেকো না বাপু, আমার লজ্জা করে।'

মাষ্টার-মশাই বলিলেন, 'চমৎকার রান্না করেছে সুকুমারী। শেখো, তুমি ওর কাছে রান্নাটা শিখে নাও।'

তুলসী হাসিতে লাগিল।

মাষ্টার-মশাই জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হাসছো কেন গো?'

কিন্তু সে-হাসির অর্থ সে গোপন করিল। গোপন করিবার কারণ এই যে, সুকুমারীকে রান্না সে আজ করিতে দেয় নাই, নিজেই রান্না করিয়া সুকুমারীর নাম বলিয়াছে।

সে যাই হোক্, সুকুমারীকে মাষ্টার-মশাইয়ের মন্দ লাগিল না। বলিলেন, 'যে মেয়ের স্বভাব-চরিত্র ভাল, তাকে আমার খুব ভাল লাগে, বুঝলে?'

তুলসী জিজ্ঞাসা করিল, 'ভাল তা তুমি কেমন করে' জানলে?'

মাষ্টার-মশাই বলিলেন, 'মানুষ চিনতে আমার দেরী হয় না গো, একবার দেখলেই আমি চিনতে পারি।'

তুলসী বলিল, 'ছাই পারো।'

আজ শুভদিন

*

*   *

তিন-চারদিন পরেই সেখান হইতে মাষ্টারের বদ্‌লির হুকুম আসিল। বদ্‌লি হইয়াছেন বড় একটা জংসন-ষ্টেশনে। শঙ্করীকে লইয়া সুকুমারীও তাহাদের সঙ্গে গেল।

সুকুমারীর সঙ্গে তুলসীর ঘনিষ্ঠতা আজকাল অত্যন্ত বাড়িয়া গেছে। একজন মনিব, আর একজন দাসী। কিন্তু সে সম্বন্ধ তাহারা অস্বীকার করিয়া একদম উড়াইয়া দিয়াছে। তুলসীই প্রথমে তাহাকে তুমি বলিতে বলিতে হঠাৎ একদিন 'তুই' বলিয়া হাসিয়া একেবারে অস্থির হইয়া গিয়া, সুকুমারীকেও জোর করিয়া 'তুই' বলাইয়াছে।

মাষ্টার-মশাই দিবারাত্রির প্রায় অধিকাংশ সময় ষ্টেশনেই থাকেন। বাড়ীতে থাকে তাহারা দু-জন আর শঙ্করী। হাসির গল্প করিয়া, বই পড়িয়া, সুখ-দুঃখের কথা কহিয়া দিন তাহাদের মন্দ কাটে না।

সুকুমারী বলে, 'ছাখ তুলসী, এটা কিন্তু ভারি খারাপ হচ্ছে ভাই।'

—'কি খারাপ হচ্ছে, শুনি?'

—'আমাদের দু-জনে এই এত মাখামাখি, এত ভাব···'

তুলসী বলে, 'তোর মাথা হচ্ছে, তোর পিণ্ডি চটকাচ্ছি।'

সুকুমারী বলে, 'না ভাই, সত্যি বলছি। আমাদের গাঁয়ে

এক বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে সই পাতিয়েছিলাম। আমাদের দু-জনের সেই ছেলেবেলা থেকে এত ভাব ছিল যে, কেউ কাউকে একদণ্ড না দেখলে থাকতে পারতাম না। শেষ পর্য্যন্ত আমাদের সেই বন্ধুত্ব কিন্তু টিক্‌লো না।'

তুলসী বলে, 'সে ছিল বড়লোকের মেয়ে, আর আমি হচ্ছি গরীবের মেয়ে। তফাৎ অনেক।'

সুকুমারী বলে, 'কিন্তু দেখতে ভাই তুই তার চেয়েও সুন্দরী। প্রথমে আমার সইকে দেখে ভাবতাম, তার মতন সুন্দরী বোধহয় দুনিয়ায় আর দুটি নেই, কিন্তু তুই ভাই তাকেও হার মানিয়েছিস্।'

তুলসী ম্লান একটু হাসিল। হাসিয়া বলিল, 'সেইজন্যেই আজ আমার সুখের সীমে নেই।'

কথাটার অর্থ সুকুমারী বুঝিল, এবং বুঝিয়াই সে চুপ করিয়া রহিল। তুলসী আবার বলিল, 'কি হলো আমার এই রূপ নিয়ে?'

আর কোনও কথা না বলিয়া সেখান হইতে সে উঠিয়া গেল। আর কিছু বলিবার প্রয়োজনও হইল না। তুলসীর স্বামীকে দেখিয়া অবধি তাহার দুঃখের কথা সুকুমারী বুঝিয়াছিল, কিন্তু অদ্ভুত এই মেয়েটির হাসি-হাসি মুখখানি দেখিয়া কোনোদিনই তাহার মনের কথা সে টের পায় নাই। এতদিন পরে আজ শুধু সে মুখ ফুটিয়া এইটুকু মাত্র বলিয়া ছুটিয়া পালাইয়া গেল।

সমস্তটা দিন তাহাদের একরকম মুখ বুজিয়াই কাটিল। নিতান্ত প্রয়োজনীয় দু-একটা কথা ছাড়া অন্যদিনের মত বসিয়া বসিয়া গল্প সেদিন আর তাহারা করিল না।

এখানকার এই ষ্টেশনের প্রত্যেক কোয়ার্টারে জলের কলের ব্যবস্থা। সন্ধ্যার আগে সেদিন তাহারা কল-ঘরে গা ধুইয়া কাপড় কাচিয়া অন্যদিনের মত জানলার কাছটিতে গিয়া চুপ করিয়া বসিল। এখানে বসিলে ষ্টেশনের অনেক-কিছু দেখা যায়। সশব্দে ট্রেণ আসিয়া প্লাটফর্মে দাঁড়ায়, কত লোক নামে, কত লোক ওঠে, ফিরিওয়ালা চীৎকার করে; আর ইহারা দু-জনে সংসারের কাজকর্ম্ম সারিয়া শঙ্করীকে লইয়া হাসি-রহস্যে মত্ত হইয়া থাকে। কোনোদিন-বা সুখ-দুঃখের গল্প করে। সেদিনও তাহারা গল্প কবিবার জন্যই বসিয়াছিল, এমন সময় সুকুমারী দেখিল—তুলসী তাহার একখানা চুলপাড় ধুতি পরিয়া আসিয়াছে। দেখিবামাত্র সে বলিয়া উঠিল, 'এ আবার তোর কি ঢং তুলসী, আমার কাপড় পরেছিস্ যে?'

তুলসী বলিল, 'আমার কাপড়গুলো সব ভিজে রয়েছে ভাই, শুকনো কাপড় আবার বাক্স থেকে বের করতে হয় তাহ'লে।'

—'তাই ব'লে সধবা মেয়ে, ধুতি পরবি কি-রকম। ওঠ্। বাক্স খুলে শাড়ী বের করবি চল্।' বলিয়া সুকুমারী তাহাকে একরকম জোর করিয়াই সেখান হইতে তুলিবার চেষ্টা করিল।

তুলসী বলিল, 'দাঁড়া দাঁড়া, যাচ্ছি, শোন্। বোস্ এইখানে।'

সুকুমারী বসিল। বলিল, 'বল্ কি বলছিস্।'

তুলসী বলিল, 'ধুতি পরলে আমাকে খুব খারাপ দেখায়?'

—'কি যে বলিস্ তার ঠিক নেই। নে—ওঠ্।'

—'না, তুই বল্ আগে। না বললে আমি উঠবো না।'

সুকুমারী বলিল, 'খারাপ তোকে কিছুতেই দেখায় না। তাই ব'লে ধুতি পরবি কোন্ দুঃখে। ছি।'

তুলসী তাহার সেই ঢলঢলে কালো চোখ দুইটি তুলিয়া সুকুমারীর মুখের পানে একবার তাকাইল। বলিল, 'একদিন তো পরতেই হবে।'

—'তা সে যেদিন হবে সেদিন হবে, আজ কেন?'

—'আজ একবার তাই সাধ হলো—পরে' দেখলাম মানায় কিনা।'

সুকুমারী বলিল, 'আ মরি-মরি, কি সাধ লো! তার চেয়ে ভগবানের কাছে বল্ না, তার আগে যেন তুই মরে যাস্।'

তুলসী হাসিল। বলিল, 'হ্যাঁ, আমার ওপর ভগবানের দয়া কত! আমার সব সাধই তো সে মিটিয়েছে, তাই সধবা হয়ে মরার সাধও মেটাবে।'

এই বলিয়া একটুখানি থামিয়া হেঁটমুখে কি যেন ভাবিয়া হাসিতে হাসিতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'চল্।'

ধুতি ছাড়িয়া তুলসী শাড়ী পরিল, রঙিন একটি ছোট জামা গায়ে দিল, তাহার পর আবার সেই জানলার কাছটিতে

আসিয়া বলিল, 'আচ্ছা সুকুমারী, আমায় যে তুই মরতে বলছিস্, আমি মরে গেলে তুই হতভাগী যাবি কোথায়? রূপ-যৌবন তো এখনও যায়নি, তারই জোরে একটা বেছে নিবি ভাবছিস্, না কী?'

—'আ-মর্! তাহ'লে সে অনেক আগেই তো নিতে পারতাম। তোর বাঁদীগিরি করতে আসতাম না, তা জানিস্?'

—'তবে?'

—'তবে আবার কি?'

—'আচ্ছা ধর্, আমি যদি এখন মরে যাই তো তুই কি করবি বল্ দেখি?'

সুকুমারী তাহার মেয়েটার মুখের পানে একবার তাকাইল। তাহার পর বলিল, 'তোর সঙ্গেই চলে যাবো।' বলিয়া সে শঙ্করীর দিকে আঙুল বাড়াইয়া বলিল, 'এইটের জন্যেই তো ভাবনা। তা ওর যা কপালে আছে তাই হবে।'

—'কেমন করে' যাবি আমার সঙ্গে? মরণ তো তোর হাত-ধরা নয়, যে ডাকলেই আসবে।'

সুকুমারী হাসিল। বলিল, 'সে আমি তখন দেখে নেবো, তোকে সেজন্যে ভাবতে হবে না। ওই তো এত-এত গাড়ী চলছে ইষ্টিশানে, রাত্তিরবেলা চুপিচুপি যদি ওই গাড়ীর মুখে গিয়ে পড়ি তো তোর চোদ্দ-পুরুষ এলেও আমাকে বাঁচাতে পারবে না, তা জানিস্?'

এই বলিয়া দু-জনেই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

তাহার পর তুলসীই আগে কথা বলিল।

হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া তুলসী কহিল, 'না, আমি মরবো না সুকুমারী।'

সুকুমারী তাহার মুখের পানে তাকাইয়া ঈষৎ হাসিল মাত্র।

তুলসী বলিল, 'আচ্ছা, এর পর আমরা কি করবো বল্। তোরও যাবার কোথাও জায়গা নেই, আমারও নেই।—আমার আছে, কিন্তু আমি সেখানে যাবো না।'

সুকুমারী বলিল, 'আমি কেমন করে' বলবো বল্। তুই যেখানে যাবি, আমিও সেইখানে যাবো—এই তো জানি।'

তুলসী বলিল, 'হাজার-দশেক্ টাকা হাতে আমার থাকবে, বুঝলি? লাইফ-ইন্সিওরের টাকা আছে, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড আছে, আর হাতেও আমার কিছু কিছু জমছে। এই সব জড়িয়ে দশ হাজার টাকা যদি আমি পাই, এই মেয়েটার বিয়ের খরচ করবো হাজারখানেক্। থাকবে—ন-হাজার! আমরা দু-জনে সারা জীবন ধরে' খেয়ে-পরেও মেয়েটার জন্যে অনেক-কিছু রেখে যেতে পারবো।'

সুকুমারী বলিল, 'কি জানি ভাই, এত এত টাকার কথা আমি ভাবতেও পারি না। একসঙ্গে দশটা টাকার বেশি কোনোদিন আমি চোখেও দেখিনি।'

তুলসী বলিল, 'তাহ'লে কপালটা তোর ভালই বলতে হবে। দশ টাকা দেখিস্নি, দশ হাজার দেখবি।'

সুকুমারী বলিল, 'দশ হাজার দেখতে চাই না ভাই, তোকে

যেন চিরকাল দেখতে পাই। তোকে না পেলে আমার কি যে হতো কে জানে! এতদিন হয়তো পাঁচ-ভূতে আমাকে টেনে-হিঁচড়ে খেয়েই ফেলতো।'

—'খেয়ে ফেলা এতই সোজা, না?'

—'তা ভাই আমি একা মেয়েমানুষ, কি করতাম?'

—'কি করতিস্? তবে শুনবি আমি কি করেছি? তোর তো তবু এখন বয়েস হয়েছে, আর আমি যখন নিতান্ত ছেলেমানুষ—সেই তখন থেকে আমার ওপর কত মুখপোড়ার যে নজর পড়েছে তার ঠিক নেই। কিন্তু কই, কেউ তো কিছুই করতে পারেনি।'

সুকুমারী বলিল, 'আমি ভাই বড় দুর্ব্বল। জোর করে' কাউকে কিছুই বলতে পারি না। শুধু কেঁদেই মরি।'

তুলসী বলিল, 'কাঁদলে ওরা শোনে না। মারতে হয় মুখে এক লাথি! চোয়ালে ঘুষি মেরে দাঁত ভেঙে দিতে হয়, আর নইলে নাকে মারতে হয় এক কিল! তখন বুঝতে পারে—না, এ সোজা নয়।'

—'কি জানি ভাই 'জীবনে সেই একবার মাত্র একটা কাণ্ড ঘটেছিল। দেখলাম, হাত-পা অবশ হয়ে এলো, থর্‌থর্ করে' শুধু কাঁপতে লাগলাম।'

—'আ-মর্ হতভাগী, হাত-পা অবশ হয়ে এলো কি লা! ভালবেসে কাউকে কোনোদিন ধরা যদি দিই তো সে কথা আলাদা। তা নইলে—'

আজ শুভদিন

এই পর্য্যন্ত বলিয়া কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়াই তুলসী হাত বাড়াইয়া সুকুমারীকে জড়াইয়া ধরিল, তাহার পর তাহার একান্ত সন্নিকটে সরিয়া গিয়া চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করিল, 'হ্যাঁরে সুকু, তোর বর তোকে খুব ভালবাসতো, না ?'

সলজ্জ একটুখানি হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া সুকুমারী বলিল, 'হ্যাঁ ভাই, আমিও খুব ভালবাসতাম। সে-কথা আজও মনে হলে' আমার—'

কথাটা সে আর শেষ করিতে পারিল না, ঠোঁট দুইটা তাহার থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিল, চোখ দুইটা জলে ভরিয়া আসিল। আর তাহার একান্ত সন্নিকটে বসিয়া হাত দুইটা তাহার নিজের মুঠার মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া তুলসীও তাহার সর্ব্বাঙ্গে কেমন যেন একটা বিদ্যুৎ-শিহরণ অনুভব করিতে লাগিল।

বুড়া ষ্টেশন-মাষ্টারের পরমায়ু যে শেষ হইয়া আসিয়াছে সে-কথা জানিত সকলেই; তবে এত শীঘ্র যে তিনি মারা যাইবেন, তুলসী কিম্বা সুকুমারী—কেহই তাহা ভাবিতে পারে নাই।

জংসন-ষ্টেশনে বদ্‌লী হইয়া তিনি অনেকদিন কাটাইলেন।

সে-বৎসর শীতকালে তাঁহার ডিউটি পড়িল রাত্রে। বুড়া মানুষ, একে শীতকাল, তায় আবার রাত্রি জাগরণ। আপাদ-মস্তক গরম কাপড় মুড়ি দিয়া কানে-মাথায় কম্‌ফটার্ জড়াইয়া শীতটাকে প্রতিরোধ করিবার চেষ্টার ত্রুটি তিনি করিলেন না, কিন্তু প্রায়ই তিনি কাজ সারিয়া বাসায় ফিরিতে লাগিলেন খক্ খক্ করিয়া কাশিতে কাশিতে।

তুলসী জিজ্ঞাসা করে, 'হ্যাঁ গা, রাত্রের কাজ আর তোমার কতদিন ?'

মাষ্টার-মশাই বলেন, 'ধুৎ তেরি, রেলের চাকরি আবার মানুষে করে!'

তুলসী বলে, 'কেন, রাত্রের ডিউটি তুমি দিনে করে' নিতে পারো না!'

—'দরখাস্ত তো করেছি, দেখি কতদিন লাগে।'

কিন্তু ততদিন অপেক্ষা করিবার সবুর আর সহিল না। দিনে ডিউটি হইবার আগেই তিনি জ্বরে পড়িলেন। সংসারে মাত্র দুটি মেয়েমানুষ। এমন একটা পুরুষমানুষ নাই যে ডাক্তার ডাকিয়া আনে। শঙ্করী তখন বড় হইয়াছে। তাহাকে দিয়াই সব কাজ চলিতে লাগিল। রেলের সরকারী ডাক্তারের বাসা বেশি দূরে নয়। শঙ্করী নিজে গিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া আনিল।

রোগী দেখিয়া ডাক্তারবাবুর মুখের চেহারা কেমন যেন একটুখানি অন্যরকম হইয়া গেল। তুলসী বা সুকুমারী

কেহই তাঁহার কাছে যায় নাই। পাশের ঘরে দাঁড়াইয়া জানলার ফাঁক দিয়া সবই দেখিতেছিল।

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'জ্বর কবে থেকে হয়েছে?'

জ্বরের জোরে মাষ্টার-মশাই বেহুঁস হইয়া পড়িয়াছিলেন। শঙ্করী বলিল, 'পরশু থেকে।'

—'হুঁ।' বলিয়া ডাক্তারবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, 'সাবন আছে? একটুখানি জল আর সাবন দিতে পারো, খুকি?'

শঙ্করী বলিল, 'আপনি আসুন আমার সঙ্গে। হাত ধোবেন তো?'

এই বলিয়া ডাক্তারবাবুকে সে স্নানের ঘরের দরজায় লইয়া গেল।

সাবান দিয়া হাত ধুইতে ধুইতে ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার আর ভাই নেই বুঝি?'

শঙ্করীকে তিনি যে মাষ্টার-মশাইএর মেয়ে ঠাওরাইয়াছেন সে-কথা বুঝিতে তাহার দেরি হইল না। শঙ্করী তাঁহার হাতের উপর জল ঢালিয়া দিতে দিতে বলিল, 'আমি ওঁর মেয়ে নই।'

—'ওঁর মেয়ে নও?' বলিয়া তিনি তাহার মুখের পানে তাকাইয়া বলিলেন, 'সান্যাল-মশাইএর ছেলে-মেয়ে কোথায় আছে? দেশে?'

শঙ্করী বলিল, 'ছেলে-মেয়ে ওঁর নেই।'

কথাটা শুনিয়া ডাক্তারবাবু কেমন যেন একটুখানি বিস্মিত হইয়া গেলেন। বলিলেন 'ওঁর কে আছেন এখানে?'

—'স্ত্রী আছেন।'

—'ভাই-টাই নিজের লোক কেউ নেই?'

ঘাড় নাড়িয়া শঙ্করী বলিল, 'না।'

ডাক্তারবাবু বলিলেন, 'দেশে একটা খবর দিতে বলো। বুঝলে খুকি।'

মাষ্টার-মশাইএর স্ত্রী যাহাতে শুনিতে পান, এমনি ভাবে কথাটা তিনি বেশ জোরে-জোরেই বলিলেন।

তুলসী ও সুকুমারী দু-জনেই শুনিল। শুনিয়া তুলসী চাহিল একবার সুকুমারীর দিকে, সুকুমারী চাহিল তুলসীর দিকে।

হাত মুছিবার জন্য শঙ্করী তাঁহার হাতে একটা গামছা দিতে গেল। গামছা তিনি লইলেন না। 'থাক্।'—বলিয়া পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া তাহাতেই হাত দুইটা মুছিতে মুছিতে তিনি আবার বলিলেন, 'ওষুধ তুমি আমার সঙ্গে গিয়ে নিয়ে আসবে, না আমি পাঠিয়ে দেবো?'

কথাটা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য শঙ্করী পাশের ঘরে গিয়া ঢুকিল। বলিল, 'ডাক্তারবাবু বলছেন—'

সুকুমারী কথাটা তাহাকে শেষ করিতে দিল না। বলিল, 'শুনেছি। তুই যা মা আর-একবার। ওঁর সঙ্গে গিয়েই ওষুধটা নিয়ে আয়।'

ডাক্তারবাবুর সঙ্গে গিয়া শঙ্করী ঔষধ আনিল বটে, কিন্তু একফোঁটা ঔষধও তাঁহার গলা দিয়া পার হইল না। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় যেমন তিনি পড়িয়াছিলেন তেমনি পড়িয়াই রহিলেন।

তুলসী সুকুমারীর মুখের পানে তাকাইয়া ম্লান একটুখানি হাসিয়া বলিল, 'জিনিসপত্তর সব গুছিয়ে-টুছিয়ে নে সুকু।'

সুকুমারী বলিল, 'কেন?'

—'কেন আবার! এখানকার ডেরা তো উঠলো।'

—'কোথায় যাবি?'

—'কোথায় যাবো?' বলিয়া আবার একটুখানি হাসিয়া তুলসী বলিল, 'যমের বাড়ী! তাছাড়া কোথায় আর আমাদের জায়গা আছে বল্!'

সুকুমারী বলিল, 'না না, সত্যি বলছি—হাসি-ঠাট্টা রাখ্, কোথায় যাবি বল্ দেখি?'

তুলসী বলিল, 'তুই-ই বল্ না!'

সুকুমারী বলিল, 'কাশী যাই চল্।'

—'সেই ভাল।' তুলসী বলিল, 'টাকাকড়িগুলো আদায় করে' নিয়ে চল্ কাশীই যাই। সেইখানেই মেয়েটার একটা ব্যবস্থা করবো গিয়ে!'

ডাক্তারবাবু লোকটি বড় ভাল। ইহাদের এই অসহায় অবস্থায় দেখিয়া বৈকালে তিনি নিজে তো একবার আসিলেনই, তাহার উপর দেখা গেল, বাসায় ফিরিয়া গিয়া তিনি তাঁহার

স্ত্রীকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। স্ত্রী তাঁহার একা আসেন নাই, সঙ্গে আসিয়াছে তাঁহার দুটি বড় বড় মেয়ে, ছোট একটি ছেলে আর একটা চাকর।

অপরিচিতকে পরিচিত করিয়া লইতে সুকুমারী এবং তুলসী দু-জনেই ওস্তাদ। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ডাক্তারবাবুর স্ত্রী হইল তাহাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু। কত কথা যে তাহাদের হইল তাহার আর অন্ত নাই।

ডাক্তারবাবু এখানে খুব অল্পদিন আসিয়াছেন। মেয়ে দুইটি তখন শঙ্করীর সঙ্গে ভাব জমাইয়াছে। তাহাদেরই মুখের পানে তাকাইয়া ডাক্তার-গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এখানে আমাদের ক-মাস হলো রে, বীণা ?'

বীণা বলিল, 'সাত মাস এসেছি আমরা।'

ডাক্তার-গৃহিণী বলিলেন, 'আপনারা এই এত কাছে আছেন জানলে আমি রোজ একবার করে' আসতাম।'

যাই হোক্, যে-কথাটা তিনি বলিতে আসিয়াছিলেন সে-কথাটা তেমন ভাল নয়। বলিতে আসিয়াছিলেন—সান্যাল-মশাইকে এ-যাত্রা বাঁচানো বড় শক্ত। যদি বাঁচেন তো সে একমাত্র ভগবানের হাত।

কিন্তু কথাটা তাঁহাকে কষ্ট করিয়া আর বলিতে হইল না। দেখিলেন—ইহারা তাহা জানে।

ডাক্তার-গৃহিণী বুঝিতে পারিতেছিলেন না—ইহারা দু-জনে

কে। দুই বোন্ নয় তো? জিজ্ঞাসা করিতে কেমন যেন লজ্জা করিতেছিল।

অবশেষে হঠাৎ একসময় তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন, 'উনি আপনার কে হন্?'

সুকুমারীর মুখের পানে তাকাইয়া তুলসী বলিল, 'ইনি? ইনি আমার দিদি।'

ডাক্তার-গৃহিণী দু-জনের মুখের দিকে ঘনঘন তাকাইতে লাগিলেন।

সুকুমারী হাসিয়া বলিল, 'বিশ্বাস হচ্ছে না?'

ডাক্তার-গৃহিণী অপ্রতিভ হইয়া গেলেন। বলিলেন, 'না, বিশ্বাস হয়েছে, তবে কি-না…'

সুকুমারী বলিল, 'তবে কি-না কী?'

ডাক্তার-গৃহিণী বলিলেন, 'দেখছি।'

—'কি দেখছেন?'

—'দেখছি আপনাদের রূপ। সুন্দরী যদি বলতে হয় কাউকে তো আপনাদের দু-জনকেই বলা উচিত।'

আবার তাহাদের সৌন্দর্য্যের কথা উঠিয়া পড়িল দেখিয়া সুকুমারী তখনি কথাটাকে পাল্টাইয়া দিল। কারণ সে জানে, মেয়েরা যদি একবার রূপ-যৌবন আর গহনার কথা আরম্ভ করে তো সহজে তাহার আর শেষ হইতে চায় না।

সুকুমারী বলিল, 'আপনার দুটি মেয়েই তো দেখছি বড় হয়েছে। বিয়ে দেবার কি ব্যবস্থা করছেন দিদি?'

—'সে-কথা আর বোলো না ভাই। ছুটি পাত্রের খবর পেলাম, তা এম্‌নি অভাগীর কপাল যে, ছুটির মধ্যে কারও সঙ্গেই কোষ্ঠীর মিল হলো না।'

সুকুমারী বলিল, 'আমার মেয়েটার কি যে গতি হবে ভাই কে জানে।'

ডাক্তার-গৃহিণী বলিলেন, 'আপনার মুখুজ্জ্যে-পাত্র হলে' যদি চলে তো একবার পান্‌হাটিতে চেষ্টা করে' দেখতে পারেন। পাত্রটির নাম—শিবনাথ।'

কিন্তু সুকুমারীর সমস্ত ভার যে লইয়াছে, সে তখন তাহার মুমূর্ষু স্বামীকে একবার দেখিবার জন্য পাশের ঘরে চলিয়া গিয়াছে।

সুকুমারী বলিল, 'তাই দেখবো ভাই। আপনারাও আমাদেরই মতন কুলীন-বামুন তাহ'লে?'

ডাক্তার-গৃহিণী বলিলেন, 'হ্যাঁ।'

কথায় কথায় সন্ধ্যা হইয়া গেল। রেলওয়ে কোয়ার্টারের সর্বত্রই তখন ইলেকৃট্রিকের আলো জ্বলিয়াছে। সুকুমারীও উঠিয়া গিয়া ঘরের আলো জ্বালাইয়া দিল।

ডাক্তার-গৃহিণী বলিলেন, 'তাহ'লে আমি আজ যাই ভাই, কাল আবার সময় করে' একবার এসে দেখে যাবো।'

বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মেয়েদের বলিলেন, 'ওঠ্‌, মা, চল্‌। ভোলাকে ডাক্‌। ওকে আমি বলে' দিয়ে যাই।'

আজ শুভদিন

ভোলা-চাকরটা বাহিরেই দাঁড়াইয়াছিল। দরজার কাছে আসিয়া বলিল, 'আমাকে ডাকছেন, মা?'

তুলসীও তখন পাশের ঘর হইতে এ-ঘরে আসিয়াছে। বলিল, 'উঠলেন এরই মধ্যে?'

—'হ্যাঁ ভাই, আবার কাল আসবো। আমার এই ভোলা চাকরটাকে রেখে গেলাম আপনাদের কাছে। যখন যা দরকার হবে, একে দিয়ে—'

তুলসী বলিল, 'না, না, চাকরের দরকার হবে না, থাক্।'

ডাক্তার-গৃহিণী কিন্তু কিছুতেই শুনিলেন না। বলিলেন, 'দরকার নিশ্চয়ই হবে। আমি বলছি—ভোলাকে একটা দিন এইখানে রাখুন। বাড়ীতে একটা ব্যাটাছেলে নেই—কি যে বলেন…'

তুলসী ও সুকুমারীকে বাধ্য হইয়া রাজী হইতে হইল। ভোলাকে রাখিয়া ডাক্তার-গৃহিণী তাঁহার ছেলে-মেয়েদের লইয়া চলিয়া গেলেন।

তুলসী বলিল, 'ডাক্তারবাবু লোকটি বড় ভাল। দেখেছিস্ সুকু, বাড়ী গিয়ে স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিয়েছে।'

সুকুমারী বলিল, 'হুঁ।'

তাহার বেশি আর কিছুই সে বলিতে পারিল না। কারণ, পৃথিবীর কোনও পুরুষকেই আর তাহার বিশ্বাস নাই। পুরুষ-জাতির উপর বিশ্বাসের ভিত্তি তাহার বহু পূর্ব্বেই শিথিল হইয়া গেছে।

ডাক্তারবাবু না বুঝিয়া স্ত্রীকে পাঠান নাই। ভোলা-চাকরকে তিনি যে কেন এখানে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন সে-কথা বুঝিতে পারা গেল তাহার পরদিনেই।

পরদিন সকাল হইতে বৃদ্ধ মাষ্টার-মশাইএর হাঁফ উঠিতে লাগিল। চোখ চাহিয়া মাঝে মাঝে তাকাইতেও লাগিলেন, কিন্তু সে-চাহনি কেমন যেন ফাঁকা-ফাঁকা। কাহাকেও চিনিতে পারিলেন না, মুখ দিয়া একটি কথাও কহিলেন না।

ভোলা তখনি ডাক্তারবাবুকে ডাকিয়া আনিল।

ডাক্তারবাবু রোগী দেখিয়া ভোলাকে বাহিরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। বলিলেন, 'বাড়ীর মেয়েদের বলে' দিয়ে যা, সকাল-সকাল চারটি রান্না করে' যেন খেয়ে নেয়। আজকের দিনই ওঁর শেষ দিন। ওষুধ আর দেবো না, যা।'

কথাটা ভোলা আসিয়া সুকুমারীকে বলিল। সুকুমারী বোধকরি তাহা আগেই টের পাইয়াছিল। তুলসীকে রোগীর কাছে বসাইয়া সে তখন রান্না করিতে বসিয়াছে।

মাষ্টার-মশাই সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রাণ-পণে যুঝিলেন। তাহার পর রাত্রি যখন প্রায় আটটা, তুলসীর কান্নার শব্দ পাইয়া সুকুমারী এ-ঘরে আসিয়া দেখিল—সব শেষ হইয়া গেছে।

মৃতদেহের আপাদমস্তক একটা চাদর ঢাকা দিয়া তুলসী উঠিয়া দাঁড়াইল।

সুকুমারী ভাবিয়াছিল—হয়তো-বা স্বামীর শোকে সে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িবে। কিন্তু দেখা গেল, কাতর সে হয় নাই।

কাতর হইবার আছেই-বা কি!

মাষ্টার-মশাই যে এমনি করিয়াই অকস্মাৎ একদিন মরিয়া যাইবেন তাহা সে তাহার বিবাহের পরদিন হইতেই জানে। মনে মনে শোকটাকে সে বরদাস্ত করিবার যথেষ্ট সময় পাইয়াছে।

তুলসী বলিল, 'নে, এবার কি-সব করতে হয় কর্। তোর তো এ-কাণ্ড আগেই হয়ে গেছে, জানিস্ তো সবই।'

সুকুমারী বলিল, 'ভোলাকে পাঠিয়েছি ডাক্তারবাবুর কাছে। উনি এসে আগে শ্মশানে যাবার ব্যবস্থা করুন, তারপর সবই হবে। খুচরো গোটাকতক টাকা বের করে' রাখ্—দরকার হবে।'

ডাক্তারবাবু বোধকরি প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন। সংবাদ পাইবামাত্র লোকজন সঙ্গে লইয়াই তিনি উপস্থিত হইলেন। তুলসী ও সুকুমারীকে কোনও ভাবনাই ভাবিতে হইল না।

মাষ্টার-মশাইএর মৃত্যুর পর দেখা গেল, তুলসী, সুকুমারী ও শঙ্করী তিনজনেই ডাক্তারবাবুর বাড়ীতেই আশ্রয় পাইয়াছে। তুলসী বা সুকুমারী প্রথমে কেহই সেখানে যাইতে চায় নাই। কিন্তু মাষ্টার-মশাইএর লাইফ্ ইন্‌সিওর, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড্ ইত্যাদির টাকাগুলি তুলিতে হইবে। ডাক্তারবাবুর সাহায্য ছাড়া তাহা হইবার উপায় নাই। কাজেই বাধ্য হইয়া এখানে কিছুদিন তাহাদের থাকিতেই হইবে।

ডাক্তারবাবু এবং তাঁহার স্ত্রী—দু-জনেই নিরহঙ্কার, বড়

ভালমানুষ। অভাব তাঁহাদের কিছুই নাই। বাড়ীতে দাস-দাসী রাঁধুনী সবই আছে। কাজকর্ম্ম কাহাকেও কিছুই করিতে হয় না। ডাক্তার-গৃহিণী তাঁহার ছেলে-মেয়ে লইয়া আনন্দেই দিন কাটান।

তুলসী ও সুকুমারীকে পাইয়া সে আনন্দের মাত্রা তাঁহার যেন আরও একটুখানি বাড়িয়াছে। হাসিতে হাসিতে প্রায়ই বলেন, 'টাকাগুলো হাতে পেয়েই যে ভাবছেন পালাবেন এখান থেকে, সেটি হচ্ছে না। এখানে এই গরীবের বাড়ীতে আরও কিছুদিন থাকতে হবে।'

তুলসী ঈষৎ হাসিয়া বলে, 'না ভাই, পরের গলগ্রহ হয়ে থাকতে আমি ভালবাসি না।'

কথাটা যে হাসি-রহস্য করিয়াই সে বলিয়াছে, ডাক্তার-গৃহিণী তাহা বুঝিলেন, বলিলেন, 'তা বেশ তো, গলগ্রহ হয়ে কাজ কি! যে-ক'দিন থাকবেন, হিসেব করে' খরচটা আমার মিটিয়ে দিয়ে যাবেন।'

এই বলিয়া তিনি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

তুলসী বলিল, 'আপনাকে ছেড়ে যেতে আমাদের ইচ্ছে তো করে না, কিন্তু সত্যি কথা বলছি দিদি, আমার মন শুধু টানছে কাশীর দিকে। সেখানে না গেলে মনে আমি আর শান্তি পাবো না।'

এ-কথার উপর আর কথা চলে না। কিন্তু ডাক্তার-গৃহিণী তবু ছাড়িলেন না। বলিলেন, 'আমার এই বড় মেয়েটির বিয়ে

দেবো ফাল্গুন মাসে। বিয়ে পর্য্যন্ত তোমাদের থাকতেই হবে ভাই। তারপর যেখানে যাবে যেয়ো।'

বলিয়াই তিনি জিব কাটিয়া হাসিয়া বলিলেন, 'তুমি বলে' ফেললাম ভাই, আমরা পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, 'আপনি' বলা অভ্যেস নেই।'

তুলসী বলিল, 'এবার যদি 'আপনি' বলেন তো আজই আমরা পালাবো এখান থেকে।'

বলিয়াই সে সুকুমারীর মুখের পানে তাকাইয়া মুচকি মুচকি হাসিতে হাসিতে বলিল, 'না কি বল্ সুকু?'

সুকুমারী বলিল, 'আ-মর্ পোড়ারমুখী! এত দুঃখু হয়েছে তোর, বসে' বসে' কাঁদ্ না একটুখানি, তা না—হাসছে চব্বিশ ঘণ্টা ফিক্ ফিক্ করে'।'

তুলসী বলিল, 'কাঁদতে আমার বয়ে গেছে! তোর বরং ওই আইবুড়ো ধিঙ্গি মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, তুই কাঁদ্‌গে যা!'

এই লইয়া সকলেই হাসাহাসি করিতে লাগিল।

রেল-কোম্পানীর টাকা পাইতে বিশেষ দেরি হইল না। দেরি হইতে লাগিল—লাইফ্ ইন্‌সিওরের টাকার। কলিকাতায় আপিস হইতে কোম্পানীর লোক আসিয়া জানিয়া গেল—বৃদ্ধ সান্যাল-মহাশয় সত্যই মরিয়াছেন কিনা। ডাক্তার ডেথ্-সার্টিফিকেট্ দিলেন। তুলসীর দরখাস্ত আগেই পাঠানো হইয়াছে। তবু তাহার টাকা কিছুতেই আসে না।

ডাক্তার-গৃহিণী বলিলেন, 'আমার মেয়েটার বিয়ের জন্যে

ঘটক তো লাগিয়েছিই, এই সঙ্গে তোমার শঙ্করীর বিয়েটাও সেরে দাও না ভাই।'

সুকুমারী বলিল, 'আমার মেয়ের কথা তো আমি জানি না দিদি, সে-সব জানে ওই তুলসী। এ সম্বন্ধে যা জিজ্ঞেস করতে হয়, ওকে জিজ্ঞেস করো।'

তুলসী রাজী হইল। বলিল, 'তা মন্দ নয় সুকু। দেরি তো আমাদের হচ্ছেই, এর মধ্যে মেয়েটার বিয়ে যদি আমরা দিয়ে ফেলতে পারি তাহ'লেও অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যেতে পারে।'

কাজেই তাহার পরদিন হইতে দেখা গেল, ঘটকেরা শঙ্করীর জন্যও পাত্রের সন্ধান করিতেছে।

অপছন্দ করিবার মত মেয়ে শঙ্করী নয়। যাহারাই তাহাকে দেখিতে আসে তাহারাই বলে, 'বেশ মেয়ে। কিন্তু পাওনা কিরকম হবে?'

শুনিয়া তুলসী বলে, 'আগে আপনারা ছেলেটিকে পাঠিয়ে দিন্‌গে। ছেলেটি আমরা পছন্দ করি, তারপর দরদস্তুর করবেন আপনারা।'

তুলসীর কিন্তু ছেলে আর কিছুতেই পছন্দ হয় না।

এ একেবারে যেন উল্‌টা ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। লোকে মেয়ে পছন্দ করে বাছিয়া বাছিয়া, আর তুলসী ছেলে পছন্দ করিতে লাগিল।

ঘটকেরা বলে, 'না মা, এম্‌নি করলেই তো গেছি! অপূর্ব্ববাবুরা বলছিলেন—আমাদের কি অপমান করবার জন্যে নিয়ে এলে না কি হে? মেয়েটি তো বেশ মেয়ে।'

সুকুমারী বলিল, 'তবে কাজ নেই ভাই, ও-রকম আর করিস্‌নি।'

তুলসী হাসিয়া বলে, 'বেশ, তবে যেমন হোক্‌ একটা দে জুটিয়ে, তারপর মরুক্‌ সারাজীবন জ্বলে-পুড়ে। এমন রাক্ষুসী মাও তো কখনও দেখিনি বাবা।'

এই বলিয়া একটুখানি থামিয়া তুলসী আবার ফিক্‌ ফিক্‌ করিয়া হাসিতে থাকে।

সুকুমারী বলে, 'হাসছিস্‌ যে?'

তুলসী বলে, 'আমার ভাই, বাপ-মা ছিল না। মামার বাড়ীতে মানুষ হয়েছি। দিয়েছিল তারা একটা বুড়ো-হাব্‌ড়ার সঙ্গে জুটিয়ে। জীবনে কখনও সুখ পাইনি। তারই আমি প্রতিশোধ নিচ্ছি তা জানিস্‌?'

—'তোর যা খুশি তাই কর্‌ ভাই, আমি আর কিছু বলবো না।'

তুলসী বলে, 'নিশ্চয়ই করবো। মাগ্‌না তো বিয়ে দেবো না। রীতিমত টাকা খরচ করে' দেবো।'

এমনি করিয়া পাত্র দেখা চলিতে চলিতে পানিহাটির শিবনাথ মুখুজ্যেকেই শেষে পছন্দ হইল। ছেলেটির চেহারা ভাল, বাড়ীর অবস্থা মন্দ নয়, লেখাপড়াও কিছু-কিছু জানে।

আজ শুভদিনে

ফাল্গুন মাস ছাড়া বিবাহের দিন নাই। ফাল্গুন মাসে ডাক্তারবাবুর মেয়েরও বিবাহের দিনস্থির হইয়াছে। আগে ডাক্তারবাবুর মেয়ের বিয়ে, তারপর শঙ্করীর।

মাঘ মাসের মাঝামাঝি লাইফ্ ইন্‌সিওরের টাকাটাও আসিয়া গেল।

শঙ্করীর বিবাহ চুকাইতে কাহাকেও বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। বিবাহে তুলসী অনেক টাকাই খরচ করিয়া বসিল।

সুকুমারী বলিল, 'একটু হাতটান করে' খরচপত্তর কর্ হতভাগী, নইলে শেষ বয়েসে মরবি যে?'

তুলসী বলিল, 'ভাবিস্‌নি সুকু, কাশীতে গঙ্গা আছে, গঙ্গায় জলেরও অভাব নেই। অভাবের জন্যে কারও কাছে হাত পাতবার মতন অবস্থা যদি হয় তো গঙ্গায় ডুবে মরলেই চলবে।'

যাই হোক্, বিবাহ দিয়া তুলসী ও সুকুমারী তাহাদের কাশী যাইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিল।

যাই যাই করিয়াও আরও একটা মাস কাটিয়া গেল। সামনে চৈত্র মাস। চৈত্র মাসে কাহাকেও নাকি কোথাও যাইতে নাই। তাহার উপর শঙ্করীকে শিবনাথ বৈশাখ মাসে লইয়া যাইবে বলিয়াছে। কাজেই বৈশাখ ছাড়া তাহাদের যাওয়া আর হয় না।

বৈশাখ মাসে ভাল একটি দিন দেখিয়া শঙ্করীকে শ্বশুর-বাড়ী পাঠাইয়া তুলসী কাঁদিতে বসিল।

সুকুমারী বলিল, 'থাক্‌, আর মায়াকান্না কাঁদতে হবে না।'

কাঁদিতে-কাঁদিতেই তুলসী জিজ্ঞাসা করিল, 'তুই একটু কাঁদলি না যে? তোর মত পাষাণী মা যদি আমার হতো তো মাকে আমি নিজের হাতে খুন করতাম।'

এই বলিয়া কান্না থামাইয়া তাহারা হাসিতে লাগিল।

অবশেষে কাশী যাইবার দিন তাহাদের সত্যই আসন্ন হইয়া উঠিল। যাইবার দিন ডাক্তারবাবু সপরিবারে ষ্টেশনে গিয়া তাহাদের ট্রেণে চড়াইয়া দিয়া আসিলেন।

ডাক্তার-গৃহিণী বলিলেন, 'আমাকে তোমাদের মনে থাকবে তো ভাই?'

বলিতে গিয়া চোখ দুইটা তাঁহার জলে ভরিয়া আসিল।

সুকুমারী ও তুলসী গাড়ীর জানলার পথে মুখ বাড়াইয়া হাসিয়া বলিল, 'না না, তোমরা আমাদের আবার কি করেছো যে মনে থাকবে?'

বলিতে বলিতে কাপড়ের আঁচলে চোখ মুছিয়া জোর করিয়া হাসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

তুলসী ও সুকুমারী দু-জনেই যুবতী, দু-জনেই সুন্দরী, ডাক্তারবাবুও যুবক, কাজেই ডাক্তারবাবুর গৃহিণী কোনোদিনই উহাদের সঙ্গে তাঁহাকে মুখোমুখি কথা বলিতে দেন নাই। ডাক্তারবাবুও সে আদেশ অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত এতদিন পালন করিয়া আসিয়াছেন। আজ এই বিদায়ের মুহূর্ত্তেও তিনি তাহার ব্যতিক্রম হইতে দিলেন না। গাড়ী যখন

চলিতে আরম্ভ করিয়াছে তখন তিনি তাঁহার হাত দুইটি জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া এই দুইটি মহিলার উদ্দেশে ভক্তি-ভরে একটি প্রণাম করিলেন।

*

* *

ইহার পর অনেকদিন আমরা আর কাহারও কোনও সংবাদ রাখিতে পারি নাই।

বিগত এই কয়েক বৎসরের ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া দেখা গেল, সুকুমারীর সেই যে পলাতক ছেলে শঙ্কর পরেশ-গঞ্জের বিজয়বাবুর বাড়ী আশ্রয় পাইয়াছিল, সেই শঙ্কর আজ-কাল মস্ত বড় জোয়ান হইয়াছে। চেহারা তাহার ভালই ছিল, তাহার উপর বড়লোকের বাড়ী আদরে-যত্নে মানুষ হইয়া আজকাল তাহাকে আর চিনিবার জো নাই।

ভাগ্য তাহার ভালই বলিতে হইবে! পরেশগঞ্জে গিয়াছিল সে বিজয়বাবুর বাড়ীতে চাকরের কাজ করিবার জন্য, কিন্তু চাকরের কাজ তাহাকে একটি দিনের জন্যও করিতে হয় নাই। নিঃসন্তান বিজয়বাবুর স্ত্রী তাহাকে কি চোখে যে দেখিয়াছিলেন কে জানে, সেইদিন হইতে এই শঙ্করই হইল তাঁহার একমাত্র সন্তান। বিজয়বাবুও তাহাকে ভাল বাসিলেন ছেলের মত। জমিদারের বাড়ীতে থাকিয়া ভাল খাইয়া,

ভাল পরিয়া শঙ্কর লেখাপড়া শিখিতে লাগিল। এবং শুধু তাহাই নয়, বছরখানেক পরে একদিন খুব ঘটা করিয়া বিজয়বাবু সস্ত্রীক তাহাকে পোষ্য-পুত্র গ্রহণ করিলেন। বিজয়বাবু হইলেন শঙ্করের 'বাবা', আর তাঁহার স্ত্রী হইলেন 'মা'।

পৃথিবীতে কত আশ্চর্য্য ঘটনা যে ঘটে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। সামান্য দু-মুঠা অন্নের জন্য বাবুদের ঠাকুরবাড়ী হইতে একদিন যাহাকে অপমানিত হইয়া পালাইয়া আসিতে হইয়াছিল, সেই শঙ্কর আজ ইচ্ছা করিলে দীন-দুঃখীর জন্য অন্নসত্র খুলিয়া দিতে পারে। বড় হইলে একদিন তাহাই সে দিবে মনস্থ করিয়াছে।

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়। বিজয়বাবুর স্ত্রী বহুদিন ধরিয়া রোগে ভুগিতেছিলেন। হঠাৎ একদিন তাঁহার নামে খামের একখানা চিঠি আসিল। চিঠিখানি লিখিয়াছে তাঁহার ভাইএর স্ত্রী।

চিঠি পড়িয়া তিনি ডাকিলেন, 'শঙ্কর।'

শঙ্কর বলিল, 'কি মা।' বলিয়া সে তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

মা বলিলেন, 'এই ছাখ্ বাবা, আমার ভাজ চিঠি লিখেছে কাশী থেকে। লিখেছে—তোমার শরীর খারাপ। তুমি কাশী এসো। যাবি সেখানে?'

শঙ্কর বলিল, 'চলো, তোমার যদি ইচ্ছে হয় তো নিয়ে যাই।'

—'তাই চল্ বাবা। বাবা বিশ্বনাথকে একবার দর্শন করে' আসি। আর কটা দিনই-বা বাঁচবো!'

শঙ্কর বলিল, 'আবার সেই কথা!'

মা একটুখানি হাসিলেন। হাসিয়া বলিলেন, 'মা কি কারও চিরকাল থাকে রে?'

শঙ্করের নিজের মাকে মনে পড়িল। প্রথম এখানে আসিয়া তাহার মা-বোনের কথা কাহাকেও সে বলে নাই। গোপনে শুধু তাহাদের চিঠি লিখিয়াছে। চিঠি লিখিয়া অবশ্য ফল কিছুই হয় নাই। শঙ্কর ভাবিয়াছে—মা হয়তো তাহার উপর রাগ করিয়া চিঠির জবাব দিতেছে না।

তাহার পর একদিন সে তাহার মা-বোনের সন্ধানে গোপনে একটা লোক পাঠাইয়াছিল। লোকটা ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছে—শঙ্করীকে লইয়া মা তাহার সে-গ্রাম ছাড়িয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া কোথায় যে চলিয়া গিয়াছে, কেহ কিছুই বলিতে পারে না।

মা কাহারও চিরকাল থাকে না তাহা সে জানে। আজ আবার তাহার মনে হইল, দুঃখে-কষ্টে তাহার জন্মদাত্রী জননী হয়তো স্বেচ্ছায় নিজের হাতে জীবনের যবনিকা টানিয়া দিয়াছে।

সে যাই হোক্, ইহাদের কাশী যাওয়ার কথাটাই বলি।

ভাজ তাঁহার আলাদা বাড়ী-ভাড়া করিয়া চিঠি লিখিতেই

শঙ্কর তাহার মাকে লইয়া কাশী রওনা হইল। বিজয়বাবু পরেশগঞ্জে রহিলেন। বলিলেন, 'দরকার হলে' টেলিগ্রাম কোরো।'

কিন্তু অবাক কাণ্ড, মা তাঁহার ভাজ বলিয়া যে-মেয়েটিকে দেখাইয়া দিলেন, শঙ্কর তাহার দিকে মুখ তুলিয়া সহজে আর চোখ ফিরাইতে পারিল না। দেখিতে অসাধারণ সুন্দরী তো বটেই, তাহা ছাড়া মুখখানাও কেমন যেন তাহার চেনা-চেনা বলিয়া বোধ হইল। সেইদিনই বৈকালে শঙ্কর বলিল, 'মা, তোমার ভাজটি তো দেখতে বেশ!'

মা বলিলেন, 'এককালে আরও সুন্দরী ছিল। কিন্তু হলে' কি হবে বাবা, বড় ছোটলোকের মেয়ে। ভাইটিকে আমার একেবারে অমানুষ করে' দিলে।'

শঙ্করের কিন্তু সে-সব কথা জানিবার প্রয়োজন ছিল না। সে শুধু বলিল, 'কোথায় আমি ওঁকে যেন দেখেছি মনে হচ্ছে।'

মা বলিলেন, 'তা হবে। সরোজকে নিয়ে ও প্রায়ই ঘুরে বেড়ায়। রাধানগরে ওদের বেশ বড় জমিদারী, নিজেও বেশ বড়লোকের মেয়ে।'

বড়লোকের মেয়ে শুনিয়া শঙ্কর কি ভাবিতে লাগিল। তাহার পর একসময় আপনমনেই বলিয়া উঠিল, 'বড়লোকের মেয়ে?'

মা ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ।'

—'ওঁর কি নাম বলতে পারো মা?'

—'কেন রে? তুই ওদের চিনিস্ নাকি? নাম—সুরবালা।'

সুরবালা!

সর্ব্বনাশ! শঙ্করের মায়ের সই! ইহাদেরই ঠাকুরবাড়ী হইতে ইহাদের বুড়া সরকার তাহাকে একদিন তাড়াইয়া দিয়াছিল। ইহাদেরই ঠাকুরবাড়ীতে মা তাহার দু-মুঠা অন্নের জন্য লাঞ্ছিতা হইয়াছে। সে মা তাহার আজও বাঁচিয়া আছে কিনা—ভগবান জানেন।

সেইদিনই বৈকালে দেখা গেল, মার ঘরে তাঁহার ভাই সরোজ আসিয়াছে, আর আসিয়াছে সুরবালা। শঙ্কর পাশের ঘরে বসিয়া পরেশগঞ্জে চিঠি লিখিতেছিল। হঠাৎ তাহাদের কথাবার্ত্তার মাঝখানে শঙ্কর তাহার নিজের নাম শুনিতে পাইয়া, হাতের কলম থামাইয়া দরজার কাছে গিয়া কান পাতিয়া দাঁড়াইল। শুনিল—সরোজ তাহার দিদিকে তিরস্কার করিতেছে।

—'ছেলেপুলে হলো না বলে' পুষ্যিপুত্তুর নিতেই হবে? আর যাকে তুই পুষ্যি নিয়েছিস্, ওটা—ওই শঙ্করটা কি ছেলে নাকি? শিমুলফুলের মতো চেহারাটিই শুধু দেখতে ভাল।'

মা বলিলেন, 'শঙ্করের নিন্দে কোরো না দাদা, আমার কাছে। আমি ওকে ওই এতটুকু থেকে মানুষ করেছি।'

—'মানুষ করেছিস্ তো হয়েছে কি! গরীবের ছেলে গরীবের মতো থাক্, তোর এই এত এত বিষয়-সম্পত্তি ওকে তুই দিস্নি বলছি। দিস্ যদি তো তার মত ভুল আর জীবনে কিছু হবে না।'

মা হাসিলেন। এ-ঘর হইতে হাসির শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। শঙ্কর তখন উত্তেজনায় থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে।

মা বলিলেন, 'ওকে কি তাহলে' একেবারে বঞ্চিত করে' যেতে বলছো দাদা?'

সরোজ বলিল, 'তোর যেমন কথা! আমি তা কেন বলবো? বলছি—সামান্য কিছু জমি-জমা, থাকবার মতো একখানা বাড়ী আর কিছু নগদ টাকা, এই ধর্—হাজার-খানেক্ ওকে দিয়ে, বাকি তোর যা-কিছু রইলো, দেশের একটা কোনও ভাল কাজে বরং দান করে' দিয়ে যা। নাম হবে।'

মা বলিলেন, 'আচ্ছা, সে-সব পরে হবে দাদা, ভেবে দেখবো।'

সরোজ বলিল, 'ভেবে তুই দেখবি সবই! শরীর যে-রকম হয়েছে তোর, তা দেখে তো আর ভরসা হয় না বেশি দিন বাঁচবি বলে'। যা-হোক্ তাড়াতাড়ি একটা করে' ফেলা উচিত। বলিস্ তো আমি কাগজপত্র ঠিক করে' দিই।'

মা এইবার বাঁকিয়া বসিলেন। বলিলেন, 'তোমাদের জামাইবাবুকে একথা জিজ্ঞাসা না করে' আমি কিছুই করতে

পারি না দাদা। এখন থাক্ ও-সব কথা। সকাল থেকে পেটে আবার সেইরকম যন্ত্রণা হচ্ছে—শঙ্কর! শঙ্কর!'

ইহাদের সাক্ষাতেই তিনি যে শঙ্করকে এমনভাবে ডাকিয়া বসিবেন, সরোজ তাহা ভাবিতে পারে নাই। রাগে তাহার মুখখানা সহসা লাল হইয়া উঠিল।

দরজা ঠেলিয়া শঙ্কর ঘরে ঢুকিল।—'ডাকছিলে মা?'

হাত বাড়াইয়া মা বলিলেন, 'আয়!'

শঙ্কর কাছে গিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধবিল। মুখেব চেহারা দেখিয়াই সে বুঝিতে পারিয়াছিল তাঁহার পেটের যন্ত্রণা আবার আরম্ভ হইয়াছে। তাড়াতাড়ি ঔষধ আনিয়া মার মুখে ফেলিয়া দিয়া শঙ্কর বলিল, 'চুপ করে' একটুখানি শুয়ে থাকো মা। তোমাকে এখানে আনাই আমার ভুল হয়েছে।'

চোখ বুজিয়াই মা বলিলেন, 'কেন রে?'

—'সবাই মিলে তোমায় যে এমন করে' পাগল করে' দেবে, তা যদি জানতাম মা, তাহলে' আনতাম না। ভেবে-ছিলাম—এখানে এসে একটুখানি বিশ্রাম পাবে, কিন্তু তা আর হলো না।'

—'না বাবা, আমি তো বেশ আছি।'

সরোজ উঠিয়া দাঁড়াইল। ডাকিল, 'বড় বৌ!'

বড় বৌ—সুরবালা। সর্ব্বাঙ্গে গহনা ঝল্‌মল্ করিয়া সুন্দরী সুরবালাও উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'কি?'

সরোজ বলিল, 'চলো। এদের আর বিরক্ত করতে এসো না কোনো দিন।'

সরোজ যে রাগিয়াছে, তাহা আর কাহারও বুঝিতে বাকি রহিল না। শঙ্করের কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। হেঁটমুখে তখনও সে তার মার মুখের পানে তাকাইয়া বসিয়া আছে।

তাহার এই তুচ্ছতাচ্ছিল্য ভাব, তাহার এই অবজ্ঞা, সরোজকে যেন একেবারে পাগল করিয়া তুলিল। সে আর একটি কথাও না বলিয়া সুরবালাকে লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। কাশীতে তাহারা মোটরকাব আনিতে পারে নাই। অথচ সোনারপুরা হইতে গোধূলিয়া যাইতে হইবে। গলির ভিতর টাঙ্গাও চলে না, এক্কাও চলে না। বাধ্য হইয়া তাহাদের হাঁটিয়াই গলি পার হইতে হইল। রোজই তাহারা এখানে একবার করিয়া আসে।

সুরবালা বলিল, 'বড় রাস্তায় চলো, একটা টাঙ্গা নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে' যাই। মেয়েটা একা রয়েছে।'

সরোজ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না। জ্যোৎস্না রাত, গঙ্গার ধারে ধারে চলো—চলে' যাই দু-জনে বেডাতে বেড়াতে।'

সুরবালা বলিল, 'জ্যোৎস্না রাত কি ফুরিয়ে গেল? রোজই তো আসি। কাল ওই গঙ্গার রাস্তায় ফিরবো, আজ থাক্।'

সরোজ বলিল, 'না, আর এখানে আসবো না। এই শেষ।'

সুরবালা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কি যেন ভাবিতে

লাগিল। সরোজ সত্যই চলিল গঙ্গার দিকে। সুরবালাকেও বাধ্য হইয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে হইল। পথ চলিতে চলিতে সুরবালা বলিল, 'না গো না, রাগ কোরো না। ছি! ওকে ও মানুষ করেছে, মায়া বসে' গেছে, বিষয়-সম্পত্তি ওকেই যদি দিয়ে যায় তো যাক্ না। আমাদের কি!'

সরোজের রাগ বোধকরি তখনও পড়ে নাই। বলিল, 'তুমি চুপ করো, তুমি চুপ করো। বিষয়-সম্পত্তি দেওয়াচ্ছি আমি, ছাখো না কি করি।'

*

* *

সেই তখন হইতেই সরোজ বোধকরি শঙ্করকে জব্দ করিবার ফন্দী আঁটিতেছিল। সুযোগ-সুবিধা কোনোদিনই হইয়া ওঠে নাই। শেষে সত্যই একদিন সুযোগ মিলিল। মিলিল যখন—শঙ্কর তখন সব-কিছুর মালিক হইয়া পরেশ-গঞ্জের জমিদার হইয়া বসিয়াছে। মাও মরিয়াছেন, বিজয়বাবুও মরিয়াছেন। পাঁচ বৎসর পরের কথা।

বিজয়বাবুর স্ত্রী বহুদিন হইতে রোগে ভুগিতেছিলেন। তাঁহারই আগে মরিবার কথা। কিন্তু মানুষের জন্মমৃত্যু লইয়া বিধাতা যে-খেলা খেলেন, সে-খেলার কোনও ধরা-বাঁধা নিয়ম নাই। খামখেয়ালী সে এক ভারি মজার খেলা। বিজয়বাবুর

ঘুঁটিই আগে পাকিয়া গেল। পরেশগঞ্জের বাড়ীতে হঠাৎ একদিন 'হার্টফেল' করিয়া তিনি সুস্থ শরীরেই মরিয়া গেলেন। তাঁহার স্ত্রী তখনও রোগশয্যায়। পেটের ব্যথাটা দিনে বোধকরি পাঁচবার করিয়া ওঠে। ডাক্তার-কবিরাজেরা শুধু ঔষধই দিয়া যান, রোগ নিরাময় করিতে পারেন না। কেহ বলেন, গুল্ম, কেহ বলেন, শূল। না-খাইয়া না-খাইয়া শুকাইয়া একেবারে কঙ্কালসার হইয়া গিয়া তিনি আজ তিন মাস যাবৎ বিছানায় শুইয়া আছেন।

আর ঠিক এই সময়টিতেই অকস্মাৎ এই বজ্রাঘাত।

শ্মশান হইতে ফিরিয়া আসিয়া শঙ্কর তাহার মার শয্যার পাশে গিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আছাড় খাইয়া পড়িল। কম্পিত-কণ্ঠে ডাকিল, 'মা!'

মার তখন জোর করিয়া কাঁদিবার শক্তিটুকু পর্য্যন্ত নাই। অনেকক্ষণ হইতে তিনি কাঁদিতেছিলেন, চোখ দিয়া শুধু দর্‌দর্‌ করিয়া জল গড়াইতেছিল।

মার হাতখানি দু-হাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া শঙ্কর আবার কাঁদিয়া উঠিল, 'এ কি হলো মা!'

মা তাঁহার মাথাটা ঘন ঘন নাড়িতে লাগিলেন, আর চোখ দিয়া ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া জল গড়াইতে লাগিল। অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে উচ্চারণ করিলেন, 'শঙ্কর!'

শঙ্কর মুখ তুলিয়া দেখিল, মার হাত দুইটি থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিতেছে।

—'মা, আমায় কিছু বলছো ?'

মা শুধু এপাশ-ওপাশ করিয়া নীরবে ঘাড় নাড়িলেন।

বোনের এই এত-বড় দুঃখের দিনে সরোজ বোধকরি রাগ করিয়া থাকিতে পারিল না। হঠাৎ একদিন মোটরে চড়িয়া সে পরেশগঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইল।

মার মুখে কোনও কথা নাই। শুধু কান্না আর কান্না। সরোজ আসিয়াই শঙ্করকে কাছে ডাকিল। ডাকিয়া গম্ভীর-কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, 'বিজয়ের শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা কি করেছো ?'

শঙ্কর বলিল, 'যেমন শ্রাদ্ধ তাঁর হওয়া উচিত তেমনিই হবে।'

—'টাকাকড়ি ব্যাঙ্কে কত ছিল ? সব কি তুলে নিয়েছো, না এখনও ব্যাঙ্কেই আছে ?'

শঙ্কর বলিল, 'না তুলিনি, যেমন ছিল তেমনিই আছে। শুধু জানিয়ে দিয়েছি যে, তিনি মারা গেছেন।'

—'লাইফ্ ইন্সিওর ছিল না একটা ?'

শঙ্কর বলিল, 'একটা নয়, তিনটে।'

—'কত টাকার ?'

—'ষাট হাজার টাকার।'

সরোজের মুখখানি সহসা শুকাইয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিল, 'পেয়েছো টাকাটা ?'

—'না, এখনও পাইনি। কাল-পরশুর মধ্যেই পেয়ে যাবো।'

—'তাহলে' শ্রাদ্ধটা বেশ ভাল করেই কোরো। আর—

হ্যাঁ, ছাখো শঙ্কর, টাকাকড়ির হিসেবটা রাখতে যেন ভুলো না। পরে দরকার হলে 'যেন দিতে পারো।'

শঙ্কর বলিল, 'হিসেব আবার কাকে দেবো?'

সরোজ হাসিল। বলিল, 'ছেলেমানুষ কিনা, বুঝতে পারছো না। এখনও আমার বোন বেঁচে রয়েছে, বুঝলে? প্রয়োজন হলে' হিসেবটা আমিও তলব করতে পারি।'

শঙ্করও ম্লান একটুখানি হাসিল। হাসিয়া বলিল, 'হিসেব আমি আপনাকে না-ও দিতে পারি।'

—'বটে! এ যে বেশ কথা শিখেছো হে!'

শঙ্কর তাহার জবাব না দিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

মাসখানেক পরেই মা মারা গেলেন।

এবং তাহার ঠিক অব্যবহিত পরেই আদালত হইতে শঙ্করকে জানানো হইল:

: মৃতা তারাসুন্দরী যে উইল রাখিয়া গিয়াছেন, শ্রীযুক্ত সরোজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার প্রোবেট লইতে চান। আপনার আপত্তি থাকিলে সাতদিনের মধ্যে আপনি তাহা জানাইতে পারেন।

সর্ব্বনাশ! মা তাহার উইল আবার করিলেন কবে!

নোটিসখানা শঙ্কর ভাল করিয়া ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া পড়িয়া দেখিল। দেখিল—সত্যই তাই।

শঙ্কর তাহার পরের দিনই আদালতে ছুটিল। সেখানে গিয়া যাহা সে শুনিয়া আসিল তাহা যেমন বিস্ময়কর, তেমনি অদ্ভুত। মা তাঁহার স্বনামী এবং বেনামী স্থাবর-অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি জনহিতকর কতকগুলি সৎকর্ম্মে দান করিয়া গেছেন, এবং তাহার এক্সিকিউটার নিযুক্ত করিয়া গেছেন তাঁহার অগ্রজ শ্রীযুক্ত সরোজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

শঙ্কর তাহার আপত্তি পেশ করিল।

কিন্তু আপত্তি তাহার বুঝি আর টেকে না।

শঙ্করের উকিল জিজ্ঞাসা করিল, 'উইলখানা জাল আপনি তা প্রমাণ করতে পারবেন তো?'

শঙ্কর বলিল, 'নিশ্চয়। আমি জানি আমার মা কখনও উইল করেননি। বাবা মারা যাবার পর উনি একবার আমাদের ওখানে গিয়েছিলেন, মা তখন মরো-মরো। সেই সময় আমার আসাক্ষাতে উনি নিশ্চয়ই কিছু কারসাজি করে' এসেছিলেন।'

—'আপনার মার সই আপনি এনে দিতে পারেন?'

—'পারি।'

শঙ্করের তরফ হইতে আদালতে জানানো হইল, উইলটি জাল। এবং প্রমাণ করিবার ভার শঙ্কর গ্রহণ করিতেছে, সুতরাং প্রমাণ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রোবেট লওয়া বন্ধ থাক্।

উভয়পক্ষে ঘোরতর মকদ্দমা চলিতে লাগিল।

শঙ্কর তার মার সহি আদালতে দাখিল করিল।

কলিকাতা হইতে হস্তলিখন-বিশারদ (Handwriting expert) আসিল।

অনেকদিন পরে ছোট-আদালতে মামলার নিষ্পত্তি হইল।

অনেক আশা লইয়া শঙ্কর সেদিন আদালতে গিয়াছিল। কিন্তু আদালত বলিল, উইলের সহি জাল নয়। তবে উইলখানি রেজিস্ট্রি হয় নাই। তাহার জন্য বড়-আদালতে শঙ্কর আপিল করিতে পারে।

শঙ্কর মাথায় হাত দিয়া বসিল।

*

* *

কলিকাতা হাইকোর্টে শঙ্কর আপিল করিল।

হাইকোর্টের মামলায় হইল শঙ্করের জিত।

বিচারক একটা অদ্ভুত রহস্য উদ্‌ঘাটন করিলেন। উইল লেখা হইয়াছে একটি ডামির উপর। সাদা কাগজে আগে সহি করা হইয়াছে। উইল লেখা হইয়াছে তাহার পর। সহির ঠিক উপরে উইলখানি শেষ করিবার জন্য লাইন ক্রমশঃ ঘন ঘন গাঁয়ে গায়ে আসিয়া পড়িয়াছে।

আজ শুভদিন

বিচারক পরোয়ানা বাহির করিবার আদেশ দিলেন—সরোজকুমারকে গ্রেপ্তার করা হোক্।

এবং এই গ্রেপ্তারের সংবাদ পাইবামাত্র সরোজ হইল নিরুদ্দেশ, আর সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা সুরবালা তাহার মান-সম্ভ্রম বিসর্জ্জন দিয়া স্বামীকে বাঁচাইবার জন্য মোটর লইয়া নিজে বাহির হইল পরেশগঞ্জের উদ্দেশে—শঙ্করের অনুগ্রহ লাভের আশায়।

দোতলায় শঙ্কর তাহার নিজের ঘরে বসিয়া জমিদারীর কাজকর্ম্ম করিতেছিল। এমন সময় তাহার খানসামা আসিয়া সংবাদ দিল—মোটরে চড়িয়া একজন স্ত্রীলোক আসিয়াছে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য।

—'স্ত্রীলোক?' শঙ্কর উঠিয়া দাঁড়াইয়া জানলার কাছে গিয়া হাত দিয়া জানলাটা ঠেলিয়া কপাট দুইটা খুলিয়া ফেলিল। মোটর দাঁড়াইয়া আছে—গাড়ী-বারান্দার নীচে। জানলার পথে শঙ্কর উঁকি মারিয়া দেখিল—স্ত্রীলোকটি আর-কেহ নয়—সুরবালা নিজে। কেমন যেন একটা অদ্ভুত হাসি তাহার সারা মুখের উপর খেলিয়া গেল। খানসামাকে বলিল, 'মেয়েটিকে বল্‌গে যা—বাবু আজ অত্যন্ত ব্যস্ত রয়েছেন, আজ আর তাঁর সঙ্গে কারও দেখা হবে না। ওঁকে আর-একদিন আসতে বলে' দে।'

সুরবালা যে কেন আসিয়াছে, শঙ্কর তাহা বুঝিতে

পারিয়াছিল এবং দেখা সে করিল না শুধু এইজন্য যে, এত সহজে কাজ হাঁসিল্ করা চলে না। আজ সে যাহার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে আসিয়াছে, তাহাকেই একদিন পথে বসাইবার আয়োজন যিনি করিয়াছিলেন, তাঁর শাস্তি পাওয়া একান্ত প্রয়োজন।

বিষণ্ণ-মনে সুরবালা সেদিন শঙ্করের দেখা না পাইয়া সত্যই ফিরিয়া গেল।

কিন্তু শঙ্করের মনে শান্তি নাই। সে শুধু ভাবিতেছিল তাহার নিজের কথা। ভিক্ষুকের সন্তান সে। পিতা তাহার নবীনগর রেল-ষ্টেশনে ভিক্ষা করিয়া সংসার চালাইত: তাহার পর তাহার দুঃখিনী মা ও বোন এবং সে নিজে কি কষ্টে যে দিনপাত করিয়াছে তাহা একমাত্র সে-ই জানে। তাহারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া মা-বোনের দুঃখ ঘুচাইবার জন্য একদিন সে নিষ্ঠুরভাবে তাহাদের পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। বিধাতার আশীর্ব্বাদে আজ তাহার সুখ-সম্পদের আর অন্ত নাই। কিন্তু কোথায় তাহারা? কোথায় তাহার সেই দুঃখিনী মা, কোথায় সেই শঙ্করী?

তাহাদের সন্ধান সে বহুদিন ধরিয়াই করিয়াছে, আজও তাহার সে সন্ধানের বিরাম নাই, কিন্তু কি জানি তাহারা বাঁচিয়া আছে কি মরিয়াছে কিছুই সে জানে না এবং সেই দুঃখই আজ তাহার এত আনন্দের মাঝখানে কাঁটার মত বুকের ভিতর দিবারাত্রি শুধু খচ্-খচ্ করিয়া বেঁধে। জমি-

দারীর কাজকর্ম্ম লইয়াই দিবারাত্রি তাহাকে ব্যস্ত হইয়া থাকিতে হয়, তাহার উপর সরোজের এই সর্ব্বনাশা শয়তানীর বিরুদ্ধে লড়াই বাধিয়াছে, শঙ্কর কোনোদিন একটুখানি বিশ্রামের সময় পায় না, অথচ তাহার এই অবিশ্রাম কাজের মাঝখানেও হঠাৎ যদি কোনোদিন শোনে, কোনও দুস্থা নারী কোথাও অর্থাভাবে বিপন্না হইয়া পড়িয়াছে তো তখনি সে সেইখানে ছুটিয়া যায়, ভাবে, বুঝি-বা এমনি করিয়াই তাহার মার সঙ্গে হয়তো-বা কোনোদিন দেখা হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু হায়, কোথায় তাহার মা, আর কোথায় তাহার বোন্।···

রাত্রে এক-একদিন চোখে তাহার ঘুম কিছুতেই আসে না। —ঘরের মধ্যে অন্ধকারে ক্রমাগত পায়চারি করিতে থাকে, আর কাঁদিয়া কাঁদিয়া বিধাতার উদ্দেশে এই বলিয়া বারম্বার তাহার ব্যাকুল প্রার্থনা জানায়—'কি হইবে আমার এই ঐশ্বর্য্যে ভগবান! কেন তুমি মাথায় আমার এ বোঝা চাপাইয়া দিলে! আমার সেই দুঃখিনী মাকে যদি না পাইলাম, না পাইলাম যদি আমার সেই ছোট্ট বোনটিকে তো বৃথা এ সম্পদ, বৃথা এ সুখ।···'

আজ শুভদিন

*

*　　*

কিন্তু অদৃষ্ট যাহার সুপ্রসন্ন, কোথায় কোন্ দিক দিয়া কেমন করিয়া যে তাহার মনস্কামনা পূর্ণ হয় কেহ বলিতে পারে না।

শঙ্করের জীবনেও ঠিক তেমনি করিয়া এম্‌নি একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিয়া গেল।

একদিন দুপুরে আহারাদির পর শঙ্কর একটুখানি বিশ্রাম করিতেছে, এমন সময় দুইজন ভদ্রমহিলার একটি দরখাস্ত তাহার হাতে আসিয়া পৌঁছিল। দরখাস্ত না দিয়া নিতান্ত পরিচিত আত্মীয় না হইলে শঙ্করের সঙ্গে কাহারও সরাসর দেখা করিবার উপায় নাই। ইহাই তাহাদের জমিদারী-সেরেস্তার বহুকালের প্রচলিত নিয়ম।

শঙ্কর দরখাস্তটি পড়িল।

মেয়েলী-হস্তাক্ষরে তাহাতে লেখা আছে :

'সবিনয় নিবেদন,

বাবা, শুনিয়াছি আপনি প্রজাবৎসল। এ দুঃখিনী তাই আপনার কাছে তাহার আবেদন জানাইতেছে। আবেদন-পত্রটি দয়া করিয়া আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেই আমার দুঃখের কথা আপনি বুঝিতে পারিবেন।

পানিহাটি বলিয়া আপনার যে জমিদারী-মহল আছে, সেই

গ্রামের শ্রীমান্ শিবনাথ মুখোপাধ্যায় আপনার প্রজা। সেই শিবনাথের সঙ্গে আমি আমার একমাত্র কন্যার বিবাহ দিয়াছি। কিন্তু বিবাহ দিয়া অবধি আমার কন্যার নির্য্যাতনের আর অবধি নাই। শিবনাথ অবস্থাপন্ন, কিন্তু অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত এবং দুশ্চরিত্র। বিবাহের সময় সে-কথা আমরা জানিতাম না। বিবাহের পর আমার কন্যার সমস্ত অলঙ্কার কাড়িয়া লইয়া তাহাকে সে দুই-দুইবার আমার কাছে পাঠাইয়া দিয়াছে। কিন্তু স্বামীই স্ত্রীলোকের একমাত্র আশ্রয়স্থল, তাই আমি আমার কন্যাকে আবার তাহার স্বামীর ঘরে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। পানিহাটি হইতে সেদিন তাহার এক পত্র পাইলাম। মেয়ে আমার কাঁদিয়া-কাটিয়া চিঠি লিখিয়াছে। লিখিয়াছে—তাহাকে নাকি জামাইটি আমার এমনভাবে প্রহার করিয়াছে যে, কিছুদিন সে আর শয্যা হইতে উঠিতে পারে নাই। এমনি করিয়া সেই নিরীহ অবলার উপর অত্যাচার হইতে থাকিলে সে আর বাঁচিবে না। তাই আমি সুদূর কাশী হইতে আমার এক সঙ্গিনীকে সঙ্গে লইয়া নিজে আসিয়াছি, আপনার সাহায্যে যদি ইহার কিছু প্রতিকার করিতে পারি সেই আশায়। প্রতিকার যদি করিতে পারি তো ভালই, আর তাহা না হইলে মেয়েকে লইয়া আমি কাশী চলিয়া যাইব। আমার বাবা ওই একটিমাত্র মেয়ে। ছেলে একটি ছিল, কিন্তু দুঃখের কথা বলিব কি, অদৃষ্ট বড় মন্দ, সে ছেলে আমার দশবৎসর বয়সে তাহার এই দুঃখিনী মাকে

ফেলিয়া পালাইয়া গিয়াছে। তাহার আর কোনও সন্ধান পাই নাই।......'

এইপর্য্যন্ত পড়িয়াই শঙ্কর উঠিয়া দাঁড়াইল। কাগজখানি হাতে লইয়া থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সে এদিক-ওদিক একবার তাকাইল। তাহার পর কম্পিতকণ্ঠে ডাকিল, 'গোকুল!'

গোকুল তাহার চাকরের নাম।

জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথায় এঁরা? এ দরখাস্ত তোকে কে দিলে?'

গোকুল বলিল, 'দুটি বিধবা মেয়ে।'

—'নিয়ে আয় তাদের—ওপরে নিয়ে আয়!'

গোকুল হাতজোড় করিয়া বলিল, 'আজ্ঞে, ম্যানেজারবাবু তাঁদের বলে' দিলেন যে, এখন দেখা হবে না।'

—'বলুক্‌ না, তাতে হয়েছে কি?'

—'আজ্ঞে, সেই কথা শুনে তাঁরা চলে' গেছেন।'

—'চলে গেছেন? কোথায় গেছেন?'

—'আজ্ঞে, তা তো জানি না। ঘোড়ারগাড়ী করে' তাঁরা এসেছিলেন, আবার সেই গাড়ীতে চড়েই চলে' গেলেন দেখলাম।'

শঙ্কর সেই মুহূর্ত্তে তাহার পোষাক-কামরায় গিয়া ঢুকিল। গোকুলকে বলিল, 'আমার গাড়ী আনতে বল্‌।'

কোথাও যাইতে হইলে শঙ্কর সাহেবী-পোষাক পরিয়া

ঘোড়া হইতে টপ্ করিয়া শঙ্কর মাটিতে নামিয়া পড়িল এবং ঘোড়াটাকে সেইখানেই ছাড়িয়া দিয়া সেই মহিলা দুইজনের সুমুখে গিয়া ডাকিল,—'মা… !'

বহুদিন পরে তাহার সেই ব্যাকুল আহ্বান। কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল, চোখ দুইটি জলে ভরা।

সুকুমারী ফিরিয়া তাকাইল। তুলসী ফিরিয়া তাকাইল।

মা প্রথমে ছেলেকে চিনিতে পারে নাই। কিন্তু ছেলে চিনিল তাহার মাকে। সেইখানেই সে লুটাইয়া পড়িয়া—'মা' বলিয়া সুকুমারীর পা দুইটা জড়াইয়া ধরিল।

সুকুমারী বহুদিন পরে কাঁদিতে কাঁদিতে ডাকিল, 'শঙ্কর !'

*

* *

তাহার পর কি ঘটিল সে-কথা আর নাই-বা বলিলাম।

পরেশগঞ্জের বাড়ীটা আজকাল সরগরম হইয়া উঠিয়াছে। চারিদিকে হাসি আর আনন্দের যেন উৎসব সুরু হইয়াছে। সন্ধ্যায় সেদিন শঙ্কর, শঙ্করী, তুলসী, সুকুমারী ও শিবনাথ বসিয়া বসিয়া গল্প করিতেছিল, এমন সময় চাকর আসিয়া শঙ্করকে সংবাদ দিল—'সেই যে সেই মেয়েটি একদিন এসেছিলেন মোটরে চড়ে, তিনি আবার এসেছেন।'

শঙ্কর তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। আবার সেই

জানলার কাছে গিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল—সুরবালাই বটে।

শঙ্কর বলিল, 'ওগো, তোমরা সব এ-ঘর থেকে পালাও, আমার একটুখানি বিশেষ প্রয়োজন আছে।'

সকলেই উঠিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল। শঙ্কর তাহার চাকরকে বলিল, 'নিয়ে এসো ওঁকে এইখানে।'

সুরবালা আসিয়াই শঙ্করের হাত দুইটা জড়াইয়া ধরিল। —'তোমার কাছে অনেক অপরাধ করেছি বাবা, তুমি আমাদের বাঁচাও।'

শঙ্কর বলিল, 'আমার কি ক্ষমতা আছে বলুন। আমি এর কিছুই করতে পারি না। আমার মার পায়ে ধরে' যদি ক্ষমা চেয়ে নিতে পারেন তো গ্রেপ্তারি-পরোয়ানা আমি তুলে নেবো।'

মার নাম শুনিয়া সুরবালা অবাক্ হইয়া তাহার মুখের পানে একবার তাকাইল। বলিল, 'মা! মা তো তোমার মারা গেছেন।'

শঙ্কর বলিল, 'হ্যাঁ, এক 'মা' মারা গেছেন সত্যি, কিন্তু আর এক মা আমার এখনও বেঁচে। ডাকবো তাঁকে? বড়লোকের মেয়ে হয়ে আপনি পারবেন গরীবের মার পায়ে ধরতে?'

এই বলিয়া সে 'মা' বলিয়া ডাকিতেই সুকুমারী ঘরে ঢুকিল।

আজ শুভদিন

সুরবালা তাহার মুখের পানে অবাক্ হইয়া কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিবার পর হঠাৎ তাহাকে চিনিতে পারিয়াই বলিয়া উঠিল, 'সই!'

সুকুমারী ম্লান একটুখানি হাসিয়া বলিল, 'আজ তো তোমার চেনবার কথা নয় ভাই, কিন্তু আজ তো তুমি 'সই' বলে' ঠিক চিন্‌তে পেরেছো?'

সুরবালা তাহার পা-দুইটা জড়াইয়া ধরিতে যাইতেছিল, শঙ্কর এবং সুকুমারী দু-জনে হাঁ-হাঁ করিয়া নিষেধ করিল।

শঙ্কর বলিল, 'মাকে না পেলে আমি কি করতাম জানি না, কিন্তু মাকে পেয়ে আজ আমি সকলের সব শত্রুতাই ভুলে গেছি। গ্রেপ্তারী-পরোয়ানা আমি তুলে নেবো সই-মা।'

সুকুমারী হাসিতে হাসিতে বলিল, 'ও-সব কি বলছিস্ বাছা, আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

শঙ্কর বলিল, 'সে-সব তোমার আর বুঝেও কাজ নেই মা।'

ইতি—

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

সত্তঃপ্রকাশিত দু'খানি নতুন ধরনের উপন্যাস!!

তরুণ-তরুণীদের মনের মতো 'সংলাপ'-রসাবেশের
ভাবাবেশে অধীর তন্বীর
ললিত লীলাবিলাস কাহিনী—

অভিজাত শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী

বুদ্ধদেব বসুর

অভিনব উপন্যাস

দুই ঢেউ, এক নদী

প্রকাশিত হয়েছে।

অন্ধস্নেহের বিরুদ্ধ সংঘর্ষের ঘাত-প্রতিঘাতে অসাধারণ—
দ্বিগুণ আকারের এই বিরাট উপন্যাসখানি
'বুদ্ধদেব-সাহিত্য'-পাঠেচ্ছু সুধীবৃন্দের মনোরঞ্জনের জন্য
মাত্র আড়াই টাকায়।

★ ★ ★ ★ ★

পল্লীচিত্রের স্বভাবসিদ্ধ কথাশিল্পী
বিশ্ববিশ্রুত 'রহস্যলহরী'-সম্পাদক
দীনেন্দ্রকুমার রায় রচিত

পল্লীবধূ

অপরূপ রূপলাবণ্যমণ্ডিতা হয়ে প্রকাশিত হয়েছে।
প্রচ্ছদপট-আবরণী এঁকেছেন, বিখ্যাত চিত্রশিল্পী—বি, রায়।
বিরাটায়তন এই উপন্যাসের দাম নামমাত্র ২॥০ আড়াই টাকা।

উজ্জ্বল-সাহিত্য-মন্দির
পি ১১-বি, বি. কে. পাল এভিনিউ, কলিকাতা-৫

অপরাজের কথাকার

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

বহুখ্যাত উপন্যাস—

বন্ধুপ্রিয়া

বইখানির মধ্যে এমন কিছু অসাধারণত্ব আছে, যার জন্য উপন্যাস-প্রসঙ্গে আজ তরুণ-তরুণীদের নিরালা অবসরে এই 'বন্ধুপ্রিয়া'ই একমাত্র আলোচ্য বিষয় হয়েছে!

কাছাকাছি বিভিন্ন কলেজের ছাত্র ছাত্রী এ-উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা। এমন ছাত্র ছাত্রী কত আছে। কিন্তু অলখ-দেবতা যে দুটি নর-নারীর ভবিষ্য-জীবনের যোগসূত্রে গ্রন্থি বেঁধে দেবেন, হঠাৎ দর্শনে তারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট না হ'লে তাঁর সৃষ্টির কৌশল অব্যর্থ হবে কি ক'রে? এ-ক্ষেত্রেও তাই হলো। কলেজের পথে একটি ফাঁকা ট্রামে এক পলকের দৃষ্টিপাতে নায়ক নায়িকা উভয়েই উভয়কে দেখে মুগ্ধ, কিন্তু প্রথমে কেমন ক'রে কে কি কথা কইবে সেই লজ্জায় সঙ্কুচিত, তখন শৈলজানন্দের অপরূপ সৃষ্টি একটা বন্যপশু—মানে, অপরূপ সজ্জায় সজ্জিত একটা 'বাঁদর' হঠাৎ এদের কথা কইবার সাহায্য করলে! কথাটা অসম্ভব হলেও অবাস্তব নয়—সত্য। তারপর একদিন মেয়েটি ট্রামে না গিয়ে যখন ট্যাক্সিতে উঠলো, ছেলেটিও সেই ট্যাক্সির পিছনে ট্যাক্সিতে ধাওয়া ক'রে মেয়েটির বাড়ীর দরজায় নেমে দুরুদুরু বুকে ইতস্ততঃ করছে অতঃপর সে কি করবে, তখন আশ্চর্য্য, মেয়েটিই প্রথমে কথা ক'য়ে ছেলেটিকে অভ্যর্থনা করলে,—"আসুন! আমি জানি আপনি একদিন আসবেন।" তারপর হলো প্রেমের সুরু, ক্রমে বিস্তার, তারপর তাদের প্রেমপরিণয়ের পরে এসে উপস্থিত হলো নায়কের অভিন্ন-হৃদয় এক বাল্যবন্ধু। বন্ধুর দুর্দ্দিনে অকুণ্ঠ উদার মুক্তহস্ত বন্ধু। কি চমৎকার সে বন্ধু… …

চিত্তাকর্ষক গঠনসৌন্দর্য্য। দর্শনী দু'টাকা।

'প্রেমিকা সুন্দরীতমা নেত্রে যবে বহে অশ্রুধার!'

সদ্যোসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি থেকে ছাপা হয়েছে

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতীর

নতুন উপন্যাস—

চিরবান্ধবী

সিনেমার পরদায় এই ছবিখানি দেখবার আগে এর জীবন্ত চরিত্রগুলির সঙ্গে আলাপ ক'রে রাখলে তখন বোঝবার সুবিধা হবে। কিন্তু আলাপ করবার সময় এই গ্রন্থের এক উদ্ভিন্ন-যৌবনা নিসর্গসুন্দরী মাঝে-মাঝে যখন প্রলাপের মতো অসংলগ্ন কথা কইবেন, হাসবেন, কাঁদবেন, আবার স্ব-ভাবে ফিরে এসে প্রশ্ন করবেন আর নিজেই তার সমাধান করবেন, তখন তাঁর কথায় প্রতিবাদ না ক'রে সায় দিলে মুগ্ধ হবেন। চঞ্চলা হরিণীর মতো সেই মিষ্টভাষিণী ধনীর দুলালীকে নিয়ে এসে গৃহলক্ষ্মী ক'রে রাখতে সাধ হবে।...

দর্শনী মাত্র দু'টাকা। গঠনসৌন্দর্য্য উপহারের উপযোগী।

উজ্জ্বল-সাহিত্য-মন্দির

পি ১১-বি, বি. কে. পাল এভিনিউ, কলিকাতা-৫

শাখা—কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট (দ্বিতলে) ব্লক নং সি, রুম নং ৩।

'আমার বঁধুয়া আন-বাড়ী যায় আমার আঙিনা দিয়া!'

উপন্যাসাচার্য্য

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় রচিত

আধুনিক যুগোপযোগী উপন্যাস

একবৃন্তে-দুটিফুল

জ্যোৎস্নারাতের পান্থবিহীন পথ···নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রিয়তম-সন্দর্শনের আশায় বাতায়নে অপেক্ষমানা তরুণী দেখলে তার আরাধ্য-প্রেমিককে আর-এক তন্বী-অভিসারিকার হাত ধরে যেতে···যেন একটি বোঁটায় দুটি ফুলের কুঁড়ি। সেই অবাঞ্ছিত দৃশ্য দেখে চম্‌কে উঠে সারারাত সে পিয়াসাভরা বিনিদ্র-চোখে চেয়ে রইলো কখন্ সেই কুঁড়ি দুটি ফুল হয়ে ফুটে ওঠে দেখবার আশা-আশঙ্কাভরা আকুল আগ্রহে। তারপর কখন্ যে নিরালায় সেই কুঁড়ি দুটি ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে তার আনমনে থাকার এক অশুভ মুহূর্ত্তে সে জানে না। তখন থেকে আজ পর্য্যন্ত অনন্ত কাল ধরে সে সেইদিকে চেয়েই আছে··· চেয়েই আছে···

এ-প্রতীক্ষার কি শেষ নেই? পড়বার সময় এ-উপন্যাসের চরিত্রগুলির সুখ-দুঃখ নিজের বুকে অনুভব করবেন, এমনি সৌরীন্দ্র-মোহনের অপূর্ব্ব রচনা-কৌশল।

চিত্তহারী গঠনসৌন্দর্য্য। দর্শনী দু'টাকা।

উজ্জ্বল-সাহিত্য-মন্দির

পি ১১-বি, বি. কে. পাল এভিনিউ, কলিকাতা-৫

শাখা—কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট (দ্বিতলে) ব্লক নং সি, রুম নং ৩।

একডাকে চেনা মনীষী

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের

মনোজ্ঞ উপন্যাস—

প্রিয়সঙ্গিনী

চাঁদেও কলঙ্ক আছে, কিন্তু দেবতার মত নির্ম্মলচরিত্র স্বামী সোমেশের উপর যে কোনোদিন বিশ্বাস হারাতে হবে, এ-কথা অভিজাত জমিদারবংশের শুদ্ধান্তচারিণী বধূ প্রিয়ংবদা কখনো কল্পনাও করেনি। ওর সেই দৃঢ়বিশ্বাসের মূলে সহসা কুঠারাঘাত করলে, বিলাত-ফেরত 'ডাট্'-দম্পতির আদরে-আবদারে স্বেচ্ছাচারিণী-মেয়ে অতি আধুনিকা—'ডলী'।

কাল হলো সোমেশের 'ষ্টীমার-পার্টি'।

ষ্টীমার-পার্টিতে ডলীর টুক্‌রো হাসি বিলি আর বিলোল কটাক্ষে বিহ্বল হয়ে আজন্ম-সংযমী সোমেশ নিজেকে হারিয়ে ফেললে!

বাড়ীতে ফিরে আসবার পর মা ছেলের মনের চঞ্চলতা লক্ষ্য ক'রে বিচলিতা হলেন, বধূকে ডেকে বললেন, "এতদিন বলবার দরকার হয়নি বৌমা, কিন্তু এখন শুনে রাখো,—আপনার সর্ব্বস্ব স্বামীকে দিতে হয়, কিন্তু স্বামীকে আপনার সর্ব্বস্ব ক'রে সতর্কভাবে রাখতে হয়।"

শাশুড়ীর সতর্কবাণীর ইঙ্গিত বুঝে প্রিয়ংবদা ভাবে, এও কি সম্ভব? দু'চোখে জল উপচে পড়ে—শুধু কাঁদে! * * *

তারপর সে এক তমিস্রা রাত। অভিসারিকা পরস্ত্রী 'ডলী'কে নিয়ে সোমেশ পালালো—উঠলো গিয়ে দার্জ্জিলিং মেলে। ট্রেন ছুটেছে—ছুটেছে অবিরামগতিতে। গভীর চিন্তায় ডুবে আছে দু'জনে। বারাকপুর স্টেশনের কাছে আসতেই ডলী বেঞ্চ থেকে উঠলো। সোমেশ বললে, "এ কি, উঠছো কেন?" ডলী বললে, "আমি ফিরে যাবো।" সোমেশ সবলে ডলীর হাত ধ'রে বললে, "তাই কি হয়? সে হবে না। তোমার জন্যে আমি যা ত্যাগ ক'রে এসেছি—তারপর তুমি যেতে চাইলেই কি আমি যেতে দেবো তোমায়?"…

ভবিতব্যতা। তারপর কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ালো, 'প্রিয়সঙ্গিনী' প'ড়ে দেখুন। গঠনসৌন্দর্য্য উপহারের উপযোগী। দর্শনী দু'টাকা।

উজ্জ্বল-সাহিত্য-মন্দির * পি ১১-বি, বি. কে. পাল এভিনিউ, কলিকাতা-৫

শাখা—কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট (দ্বিতলে) ব্লক নং সি, রুম নং ৩।

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতীর

বহুবাঞ্ছিত নূতন ধরনের উপন্যাস

বউ কথা কও

বইখানি রচনামাধুর্য্যে যেমন হৃদ্য, তেমনি অনবদ্য।

অনুপম সুন্দরী উদ্ভিন্নযৌবনা এই বাংলার বউ। কিন্তু···

এমন সুন্দর মুখ, অমন মধুর হাসি, লো রূপসী—মৌনমুখে ভাষা নাই কেন? কথা কও!

তবু বউ কয় না কথা···কি যে ওর মর্মব্যথা ও জানে, ওর মনই জানে!

সকলে সাধ্যসাধনা করে—ওগো লজ্জাবতী ললিতলবঙ্গলতা বাংলার বধূ, মুখ তোলো, কথা কও!···বউ, কথা কও!

কথা কইবার জন্য অভিমানিনীর বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না!

শেষে একসময় বউ মুখ তোলে···কবিগুরুর গানের ভাষায় আভাসে জানায়, সে কইবে কথা সংগোপনে, প্রিয়তমের আলাপনে তার ব্যথার পূজা সাঙ্গ হ'লে—এখন নয় গো, এখন নয়। তার মন বলে:

"সকল দুঃখের প্রদীপ জ্বেলে, দিবস গেলে করব নিবেদন,
আমার ব্যথার পূজার হয়নি সমাপন।"

তারপর এলো তাদের প্রথম মিলনের রাত—প্রথম প্রণয়ীর হাতে রেখে হাত, কইলো বউ তার যাত্রাপথের লক্ষ্যস্থান সুন্দর প্রেমনিকেতনে পৌঁছোবার যে কথা, সেই কথাই জানতে হবে এই 'বউ কথা কও' উপন্যাসের পৃষ্ঠা থেকে। অপূর্ব্ব সে কাহিনী!

বাংলার সমস্ত বইয়ের দোকানে মজুত আছে। দর্শনী দু'টাকা।

উজ্জ্বল-সাহিত্য-মন্দির * পি১১-বি, বি. কে. পাল এভিনিউ, কলি:-৫

শাখা—কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট (দ্বিতলে) ব্লক নং সি, রুম নং ৩।

যে দু'খানি নতুন ধরনের উপন্যাসের খ্যাতি
অতঃপর সাহিত্যামোদীদের মুখে মুখে প্রচারিত হবে :

অপরাজেয় কথাকার
শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের
মধুবর্ষী লেখনীর লীলাচঞ্চল চিত্রিণী—

'সুচরিতাসু'

উপন্যাস ছাপা হচ্ছে।

★ ★ ★ ★

উদীয়মান তরুণ-কথাশিল্পীদের অগ্রগতির নবনির্মিত পথে
একক অভিযাত্রী—তরুণ কথাকার

শ্রীক্ষিতীতিকুমার পালের

অতি আধুনিকতম রচনায় সমৃদ্ধ উপন্যাস

যাত্রী

(যন্ত্রস্থ) খুব শীগগির প্রকাশিত হবে।

উজ্জ্বল-সাহিত্য-মন্দির
পি ১১-বি, বি. কে. পাল এভিনিউ, কলিকাতা-৫
শাখা—কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, (দ্বিতলে) রুম নং ৩, ব্লক নং সি।

প্রকাশিত হয়েছে—

দু'টাকা সংস্করণ—

বন্ধুপ্রিয়া—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

চিরবান্ধবী—শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

একবৃন্তে-দুটিফুল—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

প্রিয়সঙ্গিনী—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

বউ কথা কও—শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

ঘরের আলো—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

আড়াই টাকা সংস্করণ—

প্রিয়া ও প্রিয়—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

দুই ঢেউ, এক নদী—বুদ্ধদেব বসু

তিন টাকা সংস্করণ—

আজ শুভদিন—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

চার টাকা সংস্করণ—

জনম্ জনম্‌কে সাথী—আশাপূর্ণা দেবী

প্রকাশ-প্রতীক্ষায়—

আলোকাভিসার—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম মিলন—শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

লক্ষ্মী এলো ঘরে—পণ্ডিত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

উজ্জ্বল-সাহিত্য-মন্দির

১১-বি, বি. কে. পাল এভিনিউ, কলিকাতা-৫

শাখা—কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট (দ্বিতলে) ব্লক নং সি, রুম নং ৩।